এই যা দেখা

লীলা মজুমদার

ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড
২, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ
বৈশাখ ১৩৬৮

প্রকাশক
কানাইলাল সরকার
২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর
দ্বিজেন্দ্রলাল বিশ্বাস
দি ইণ্ডিয়ান ফোটো এনগ্রেভিং কোং প্রাইভেট লিঃ
২৮, বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ
পূর্ণেন্দুশেখর পত্রী

ব্লক
স্ট্যাণ্ডার্ড ফোটো এনগ্রেভিং কোং প্রাইভেট লিঃ

ব্লক মুদ্রণ
চয়নিকা প্রেস

বাঁধাই
ইণ্ডিয়ান বুক বাইণ্ডিং

দাম ঃ তিনটাকা

উৎসর্গ

বাংলা দেশের ছেলে মেয়েদের জন্য

এই পুস্তকের উপাদান প্রধানত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি থেকে সংগৃহীত :

রবীন্দ্রজীবনী, চার খণ্ড ॥ রচয়িতা প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন ॥ প্রমথনাথ বিশী

শান্তিনিকেতন ॥ সুধীরঞ্জন দাশ

ঘরোয়া ॥ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জোড়াসাঁকোর ধারে ॥ ঐ

মংপুতে রবীন্দ্রনাথ ॥ মৈত্রেয়ী দেবী

জীবনস্মৃতি ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ছেলেবেলা ॥ ঐ

ছিন্নপত্র ॥ ঐ

ভানুসিংহের পত্রাবলী ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আশ্রমের রূপ ও বিকাশ ॥ ঐ

চিঠিপত্র ॥ ঐ

কলকাতা শহরের উত্তর দিকে সরু একটা সদর রাস্তা, তাতে লোকজন গাড়ি ঘোড়ার ভিড় কত, ভোর থেকে গভীর রাত অবধি হাঁকডাক ঠেলাঠেলি। লোকে বলে পথটা খুব পুরনো, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজত্ব কালে তৈরি, ঘরবাড়িগুলো এ ওর গায়ে গায়ে লেগে রয়েছে, কোথাও এক তিল ফাঁকা জায়গা চোখে পড়ে না।

এখন ওই রাস্তা থেকে বেরিয়েছে একটা অন্ধ গলি, তার ফুটপাথ নেই, গোটা কতক বাড়ি, একটা ছোট মন্দির, তার পরে আরো গোটা দুই বাড়ি পেরিয়ে মস্ত একটা লোহার ফটকের সামনে পৌঁছে গলিটা শেষ হয়ে গেছে। ফটকের ভিতরে দেখা যায় বিশাল একটা তিনতলা বাড়ি, তার সারি সারি জানলা, লম্বা লম্বা ঝিলিমিলি দেওয়া বারান্দা।

নব্বই বছর আগে ওই বাড়ির বারান্দায় বাদলা দিনে একটি ছোট সুন্দর ছেলেকে দেখা যেত। এক দৃষ্টে গলির দিকে চেয়ে আছে, মনে তার বড় আশা আজ হয়তো মাস্টারমশাই পড়াতে আসবেন না, পথঘাটে যে রকম বৃষ্টির দাপট! কিন্তু সে গুড়ে বালি, রোজই যথাসময় দেখা যেত কালো ছাতা মাথায় দিয়ে সাবধানে জল ভেঙে মাস্টারমশাই এগিয়ে আসছেন। ওই ছোট ছেলেটির নাম ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাড়িটি ওঁদের জোড়াসাঁকোর পৈত্রিক বাড়ি, গলিটির নাম দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি, বড় রাস্তাটি হল চিৎপুরের সদর রাস্তা।

যে সময়ের কথা হচ্ছে তখন কলকাতার পথে গ্যাস বাতিও জ্বলত না, বিজলি বাতিও জ্বলত না, খালি দূরে দূরে আগে রেড়ির তেলের আলো জ্বলত। পরে যখন কেরোসিনের বাতি হল সকলের মনে হত এবার কত আলো হয়েছে!

কলের জলও ছিল না তখন। পথের ধারের বাঁধানো নালা দিয়ে জোয়ারের সময় ছুড় ছুড় করে গঙ্গার জল বেয়ে এসে ঠাকুরবাড়ির পুকুরটিকে ভরে দিত, তখন মাছগুলোর সে কি আকুলিবিকুলি! তবে ও জল কেউ খেত না, সারা বছরের খাবার জল বেহারারা মাঘ ফাল্গুন মাসে গঙ্গা থেকে বয়ে এনে একতলার অন্ধকার সব ঘরে বড় বড় জালায় করে ভরে রাখত। ওই ঘুপসি স্যাঁতস্যাঁতে ঘরগুলোর কথা মনে করলেও ছোট্ট রবির বুক টিপটিপ করত।

তার উপর সারাদিন যে ঝি চাকরদের হেপাজতে থাকতে হত, তাদের মুখে কত রকম যে ভয়েব গল্প শোনা যেত তার আর লেখা-জোখা নেই। রাত হলে উঠোন পেরোতেই ভয় করত।

ভারি আশ্চর্য ছিল ওই বাড়িটা। এখানে একটা বড় উঠোন, ওখানে একটা ছোট উঠোন। সেই রকম একটা উঠোনের ধারে কোনো একটা ছোট ঘরে ববি নামে ছেলেটি জন্মেছিল। তাবপর থেকে ওই বাড়িতেই তাব দিন কেটেছে, তবু গোটা বাড়িটাকে আগাগোড়া তার কখনো দেখা হয় নি, এমনি বিরাট বাড়ি।

তাছাড়া দেখাব অসুবিধাও ছিল বিস্তর। সাবা বাড়ি জুড়ে লোকজন গিসগিস কবত, বাড়ির আত্মীয়স্বজনবা তো ছিলেনই, তার উপব চাকর, দাসী, আমলা, দবওয়ান, কোচোয়ান, পালোয়ান, পণ্ডিত, স্যাকরা, দবজি, মাস্টাবমশাই, আব বড়দের বন্ধুবান্ধব সবাই মিলে বাড়িটাকে এমনি জাঁকিয়ে বেখেছিল যে তাব মধ্যে একটা পাতলা ছিপছিপে ফবসা ছোট ছেলেব মাথা গলাবার জো ছিল না।

ফরসা ছেলে বললাম বটে, কাবণ অমন সুন্দর মানুষ কমই দেখা যায়, তবু ও-বাড়িব বেশির ভাগ লোকেবই এমন ফরসা রঙ ছিল যে রবীন্দ্রনাথেব দিদি বলতেন, 'ববি আমাদেব কালো।'

মস্ত নামকরা পবিবার ওঁদের। শুধু ধনে মানে নয়, শিক্ষা দীক্ষায়, সমাজ সংস্কাবে, দেশসেবায়, ওঁদের সঙ্গে সে সময়কার কারো তুলনা

হয় না। রবীন্দ্রনাথের ঠাকুরদাদাকে লোকে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর বলে জানত, ধনে মানে শুধু এদেশে কেন বিলেতেও তাঁর ভারি মর্যাদা ছিল। রাজারাজড়ার সঙ্গে সমানে মিশতেন, দুহাতে পয়সা খরচ করতেন। ভারি উদার, উন্নত মনও ছিল।

অকালে যখন মারা গেলেন, বড় ছেলে দেবেন্দ্রনাথকে সমস্ত বিশাল পরিবারটার অভিভাবক হয়ে দাঁড়াতে হল। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, দেনা রয়েছে বিস্তব, নগদ কিছু [illegible] সম্পত্তি ছেড়েছুড়ে দিয়ে সপরিবারে পথে দাঁড়াতে প্রস্তুত হলেন। কিন্তু পাওনাদাবদের মনেও যেন তাঁর মনের উদারতাব ছোঁয়া লেগে গেল। তাঁরা দেবেন্দ্রনাথকে বললেন, পৈত্রিক সম্পত্তির ভার নিজের হাতে নিয়ে আস্তে আস্তে ধাব শোধ করে দিতে।

করলেনও তাই দেবেন্দ্রনাথ। কয়েক বছরের মধ্যে শুধু ঋণ শোধ কেন, কবে কাকে দ্বাবকানাথ টাকা দান করবেন বলে কথা দিয়েছিলেন, সে সবও পূর্ণমাত্রায় দিয়ে দিলেন। যেমন ছিল তাঁব হৃদয়ের বিশালতা, তেমনি ছিল তাঁর মেধা। কৃতজ্ঞ দেশবাসীরা তাঁকে মহর্ষি উপাধি দিয়েছিল।

জাতে ওঁবা ছিলেন পিরালী ব্রাহ্মণ। ভালো বামুনদের ঘরে ওঁদের বিবাহাদি চলত না, কিন্তু শিক্ষা দীক্ষায় ছিলেন সমাজের নেতা। এক কথায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আধুনিক বাংলাব গুরু বলা যেতে পারে। যে কজন মনীষী সে-কালেব হিন্দু সমাজেব প্রাচীন সংকীর্ণতা ত্যাগ কবে আধুনিক শিক্ষার আলোয় উদ্‌ভাসিত, প্রাচীন আদর্শে অনুপ্রেরিত একটা সুন্দর, সুরুচিসম্পন্ন, বলিষ্ঠ দেশাত্মবোধের স্বপ্ন দেখতেন, রাজা রামমোহন রায় ছিলেন যাঁদের নেতা, দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁদের অগ্রণী।

এমনি বাপের ছেলে রবীন্দ্রনাথ। তাঁর বড় আরো তেরোজন দাদা দিদি ছিলেন। এক বছরের ছোট একটি ভাইও হয়েছিল,

কিন্তু সে বাঁচে নি। বড় ভাইবোনদের বেশির ভাগের সঙ্গেই বয়সে অনেক তফাৎ। সঙ্গী ছিল তাই সামান্য বড় ভাগ্নে সত্য, আর এক বছরের বড় দাদা সোমেন্দ্রনাথ। তাছাড়া বাড়ির ছোট বড় আরো ছেলে মেয়ে তো ছিলই। বাঁ ধারের বড় বাড়িতে থাকতেন মহর্ষির এক ভাইয়ের পরিবারবর্গ, তাঁরাও নেহাত অল্প সংখ্যক ছিলেন না। ওই বাড়িটাই শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথের বাড়ি। দুই বাড়ি মিলে সারাদিন সে যে কি একটা এলাহি কাণ্ড চলত সে ভাবা যায় না।

রবির দু বাড়ির দাদাদেরই ছিল নানান শখ, ভারি গুণীও ছিলেন তাঁরা। সমস্তক্ষণ বাড়িতে একটা যেন গান বাজনার, নাটক কাব্য ও সাহিত্যালোচনার মহড়া চলত। নানান নামকরা শিল্পী, সংগীতজ্ঞ, সাহিত্যকের নিত্য যাওয়া আসা ছিল।

গানের আসর, যাত্রা, শখের থিয়েটার প্রায়ই চলত। শহরের যত বিখ্যাত লোক পেটের ওপর মোটা মোটা সোনার ঘড়ির চেন ঝুলিয়ে জুড়িগাড়ি চেপে আসতেন। স্বয়ং বাংলাদেশের লাটসাহেব পর্যন্ত এসেছিলেন, এমনি ছিল তাঁদের সুনাম।

নাটক অভিনয় দেখবার জন্য দুই বাড়িব ছেলেপুলেরা উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকত, কিন্তু নিজের চোখে দেখবার বড় একটা সুযোগ হত না, কাবণ তখনকাব নিয়ম ছিল ছোট ছেলেরা বড়দেব শৌখিন ব্যাপারেব বাইরে থাকবে। জানলা দিয়ে বারান্দার রেলিংএব ফাঁক দিয়ে উঁকিঝুঁকি মেরে হাঁ করে তারা লোকেব যাওয়া আসা দেখত আর মাঝে মাঝে বাজনার ক্যাঁ কোঁ আর ক্ষীণ একটু গানের সুর শুনে সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য হত। এক আধবার খানিকক্ষণের জন্য উপস্থিত থাকার অনুমতি পেলে আহ্লাদে আটখানা হত।

ওই সব নাটক দাদারা কিংবা তাঁদের বন্ধুরাই বেশির ভাগ লিখতেন, নিজেরাই অভিনয় কবতেন। নাটক লেখা কেমন করে হয় ছোট-

বেলা থেকেই রবি অনেক দেখেছিল, একটু বড় না হতেই হাত লাগাবার ডাকও পড়ত মাঝে মাঝে। গোটা বাড়ি জুড়ে ভারি একটা নাটুকে হাওয়া বইত। কত রকম লোক যে আসত যেত তার ঠিক ঠিকানা নেই। একবার একটা লোক এসে দশটাকা বাজি ধরে এক মণ রসগোল্লা খেয়ে পকেটে পয়সা ফেলে দিব্যি চলে গেল। একবার ডাকাতদের খেলা দেখানো হল, কেমন করে বাঁশে চড়ে দোতলায় ওঠা যায়, উঁচু পাঁচিল টপকান যায়; কেমন করে রণ-পা চড়ে নিমেষের মধ্যে বহুদূর চলে যাওয়া যায়, এইসব।

তা ছাড়া বাড়িটার মস্ত মস্ত সাজানো হলঘর, ঘোরানো সব সরু সরু সিঁড়ি, অজানা অচেনা সব রহস্যে ভরা জায়গা ছোট ছেলের কল্পনার ঘোড়াকে যেন চাবুক লাগাত। এমন রঙিন ছোটবেলা কম মানুষের কপালে জোটে। ওঁদের চালচলন কিন্তু ছিল একটু সেকেলে। অন্দর মহলে মেয়েরা থাকতেন, পুরুষরা বাইরের মহলে। ছেলেরা একটু বড হতেই তখনকার নিয়ম ছিল মেয়েদের কাছ থেকে তাদের সরিয়ে বাইরের মহলে চাকরবাকবদেব জিম্মা করে দেওয়া। ছোট্ট রবি ও তার সঙ্গীদেব তখন দুর্ভোগের আর সীমা রইল না। খাওয়া দাওয়া সব কিছু ছিল চাকরদের হাতে, তাদের নামে নালিশ করবারও কোনো উপায় ছিল না। কাজেই এদিকে খাবারের ভাগেও কম পড়ত, ওদিকে যে কোনো উপায়ে ছেলেদের ঘরে আটকে বেখে চাকররা সর্বদা আড্ডা দেবার চেষ্টায় থাকত। এসব কথা কবি বড় হয়ে কতবার দুঃখ করে লিখেছেন।

দোতলার একটা ঘরের মেঝেতে খড়ি দিয়ে গোলমত একটা দাগ কেটে একজন চাকর বলত, খবরদার, এই দাগের বাইরে যেয়ো না, তাহলে বিপদ হবে। এই বলে সে দিব্যি বেবিয়ে যেত, আর ভয়ের চোটে ছোট্ট রবি বসে থাকত দাগের মধ্যে। গণ্ডির বাইরে গিয়ে সীতার কি বিপদ হয়েছিল সে কথা তার অজানা ছিল না।

জানলা দিয়ে তাদের বাড়ির পাশে একটা পুকুরে পাড়ার লোকের স্নান করা দেখে তার কত সময় কেটেছে! একটা বুড়ো বটগাছ ছিল, সেটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়েই দিন গেছে। পরে কত কবিতায় গল্পে এসব কথা ফুলের মত ফুটে উঠেছে।

তবে এসব দিনেরও শেষ হল, ছোট্ট রবি বন্ধ ঘর থেকে ছাড়া পেয়ে সঙ্গী সাথীদের সঙ্গে জুটে গেল। তারাও কম মজাদাব ছিল না। ছোট্ট একটা মেয়ে প্রায়ই বলত একটা আশ্চর্য জায়গার কথা, যেখানে সে নাকি যাওয়া আসা করে। এই বাড়িবই কোথাও সে জায়গাটা, কিন্তু খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়েও ছোট্ট রবি আর তাকে পায় নি। সেটা নাকি রাজাব বাড়ি, সে রাজার বাড়ির কথা রবি বড় হয়ে কবিতায় লিখে গেছে।

রবির বাবাও ছিলেন একজন রহস্যময় মানুষ, যেমনি সুন্দর তেমনি গম্ভীর। বেশির ভাগ সময়ই এখানে ওখানে ঘুবে বেড়ান। মাঝে মাঝে বাড়িতে এসে কিছুদিন কাটিয়ে যান, তখন বাড়িটার চেহারাই যায় বদলে। সবাই কেমন ব্যস্ত তটস্থ হয়ে থাকে, চাকর-বাকরবা সেজেগুজে ছুটোছুটি করে, রবির মা নিজে রান্নাঘরে গিয়ে রাঁধাবাড়ার তদারকি করেন, কত অতিথি অভ্যাগতেব আগমন হয়। বাবা যে একজন অসাধারণ কেউ, খুব ছোটবেলা থেকেই রবি সেটা বুঝে নিয়েছিল।

তবে অনেকদিন পর্যন্ত তাঁর খুব কাছে যাবাব সুযোগ হয় নি। দাদারাই ছিলেন তার আসল অভিভাবক। মাব কাছে রাতে শুতে যাওয়া; বুড়ি এক দিদিমা ছিলেন, মার খুড়ি, তাঁর কাছে গল্প শোনা; আর দিনের বেলা মেয়েদের তাস খেলা, গল্প করার আড্ডায় অল্পবিস্তর দৌরাত্ম্য করা, এই করে সময় কাটত। কিন্তু আসল অভিভাবক দাদারা, তাঁবাই ছোট ভাইয়ের পড়াশুনা ইত্যাদির ব্যবস্থা করতেন।

জীবনটা মোটের ওপর কাটত খুব সাদাসিধা ভাবে। জামা

কাপড়ের বিশেষ বালাই ছিল না, শীতকালেও ছুটি সুতির জামা-ই যথেষ্ট বলে মনে করা হত। তবে তাতে পকেট থাকলে খুবই ভালো—পায়ে সাধারণ চটি, এই পরেই দিন কাটত। বাড়িতে যতই বড়-মানুষির হাওয়া বয়ে যাক না কেন, ছোটদের বেলায় এই ব্যবস্থা। কিন্তু এতে কবিব যে ভালো বই মন্দ হয় নি, একথা তাঁর জীবনে বহুবার প্রমাণ হয়েছে। যখনই তাঁকে ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে তখনই অকাতরে কবতে পেবেছেন , কষ্টকে কখনো ভয় কবেন নি।

সত্যি কথা বলতে কি, আগেব তুলনায় তখন ওঁদের অবস্থা অনেক পড়ে গেছে। তবু যা ছিল তাও নেহাৎ সামান্য নয়। উড়িষ্যাতে জমিদারি, বাংলাদেশেরও একাধিক জায়গায় জমিদারি, ব্যবসা ইত্যাদি ছিল। জোড়াসাঁকোব ওই বাড়িটি কবেছিলেন দ্বারকানাথেব ঠাকুবদাদা নীলমণি ঠাকুব। দশ বিঘে জমি জুড়ে ছিল ওই বাড়ি, দালান, আস্তাবল, গোলাবাড়ি, আখড়াবাড়ি—যেখানে কুস্তিখেলা শিখত বাড়িব সব ছেলেবা, খানিকটা বাগান ছিল, পুকুব ছিল। বড়লোক বলে খ্যাতিও ছিল ওঁদেব।

লোকে ওঁদের বিষয় কত গল্প কবত। বাংলাদেশে প্রথম যে মেয়েরা শিক্ষিত হলেন, পবদার বাইরে এলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন ওঁদেব বাড়ির মেয়েবাই। ভদ্রসমাজেব মেয়েবা কি রকম আচরণ কববেন তার অনেকখানিই ওঁদেব বাড়ি থেকে স্থিব হয়ে যেত।

গোঁড়া হিন্দুবা অবশ্য সে সবেব সমর্থন কবতেন না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুব ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন, ওঁদেব বাড়িটি ছিল আদি ব্রাহ্ম সমাজের প্রাণের কেন্দ্র, এতে যে প্রাচীনপন্থীরা রুষ্ট হবেন সে আর আশ্চর্য কি? কিন্তু কালের ফেবে দেখা গেল তাঁদের সেই সব আদর্শগুলোকে শুধু বাংলা দেশ কেন, গোটা ভারতবর্ষই আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করেছে। এই রকম একটা পরিবারে যে রবীন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন ও মানুষ হয়েছিলেন, সেটা তাঁর মস্ত সৌভাগ্য।

কবিদের মন হয় বড় সূক্ষ্ম, যেখানকার যত প্রভাব সব কিছুর বিষয়ে বড় সচেতন। ছোটবেলাকার এই জীবনযাত্রা, এই পরিবেশ, এই চেনা জানা মানুষগুলো প্রত্যেকে রবীন্দ্রনাথের মনের ওপর যে ছাপ রেখে গেছে, কত না গল্পে. গানে, কাব্যে সেগুলি তিনি পৃথিবীকে দান করে গেছেন। কোনো কিছু একেবারে হারিয়ে যায় নি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রবির সঙ্গী ছুটি, সোমেন্দ্রনাথ ও সত্য, এবার স্কুলে ভরতি হল। সকাল সকাল খেয়ে দেয়ে, সেজেগুজে, বই খাতা নিয়ে, গাড়ি চেপে তাদের স্কুলে যাওয়া দেখে রবিও বায়না ধরল সেও স্কুলে যাবে। সবাই কত বোঝালেন, এখনো তোমার স্কুলে যাবার বয়স হয় নি, তা কে কার কথা শোনে! ছেলে এমনি কান্নাকাটি জুড়ে দিল যে, শেষ পর্যন্ত তাকেও সত্যি সত্যি স্কুলে ভরতি করে দেওয়া হল।

বাড়ির মাস্টারমশাই কষে এক চড় লাগিয়ে বললেন, এখন স্কুলে যাবার জন্য যত না কান্না হচ্ছে, পরে না যাবার জন্য এর চেয়েও বেশি কান্না হবে।

হলও ঠিক তাই। ইট কাঠে তৈরি বন্ধ ঘরে কয়েদ হয়ে লেখা-পড়া শেখা জীবনে ও-ছেলে সইতে পাবে নি। স্কুলে ভরতি হয়েই স্কুল পালানোর নানান অছিলা খুঁজে বেড়াত। বাড়ির শিক্ষকদের কাছেও ওই স্কুলেরই নিয়মে-বাঁধা পড়া অসহ্য মনে হত। কত সময় ভালোমানুষ মায়ের শরণাপন্ন হয়ে, মনগড়া সব ব্যামোর কথা পেড়ে মাস্টারমশাইকে সেদিনকার মত বিদায় করে দেওয়া হত।

স্কুলে কিছুতেই মন বসত না। অভিভাবকরাও সন্তুষ্ট হন না। দেখতে দেখতে তিনটে স্কুলে কিছুদিন করে পড়া হল, ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে, নর্মাল স্কুলে, ও বেঙ্গল একাডেমিতে। সব জায়গাতেই সেই একই নিষ্প্রাণ নিয়মে বাঁধা, কল্পনাবর্জিত, ধরাবাঁধা পড়ার ব্যবস্থা। মন সেখানে ফুটতে পারে না, প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। ছোট রবি কেবলি পালিয়ে বেড়ায়। বাড়ির লোকে অধৈর্য হয়ে ওঠেন, মনে ভাবেন এই ছেলেটার কিছু হবে না।

দাদারা সব জ্ঞানীগুনী ; বড় দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথকে লোকে ঋষি

বলত, দার্শনিক বলে ভক্তি করত। মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন প্রথম ভারতীয় সিভিলিয়ান। জ্যোতিন্দ্রনাথ ছিলেন সুসাহিত্যিক, ইউরোপীয় সংগীতে তুরস্ত। দিদি স্বর্ণকুমারী দেবী ছিলেন বিদুষী ও সু-লেখিকা। অন্যান্যদেরও নানান বিষয়ে প্রতিভা ছিল।

এঁদের ছোট ভাই হয়েও রবীন্দ্রনাথ কিনা সামান্য স্কুলের লেখাপড়াটাও করতে নারাজ! ছেলেটার ভবিষ্যত অন্ধকার।

কিন্তু আসলে বিদ্যাশিক্ষাব উপর তার কোনো রাগ ছিল না। লেখাপড়া শেখাবাব যে নিয়ম প্রচলিত ছিল, তাই নিয়েই ছিল গোলমাল। তার মত লেখাপড়াকে কম লোকই ভালো বেসেছে।

ছোটবেলাই ওই চাকর মহলেই দেশেব সাহিত্যে মন বসে গিয়েছিল। সন্ধ্যাবেলায় চাকরদের পাণ্ডা ব্রজেশ্বর মিটমিটে তেলের আলোতে বামায়ণ মহাভারত পড়ে শোনাত। আবতুল মাঝির মুখে বাঘের গল্প, কুম্ভিবের গল্প শুনত। মেয়েদের মজলিসে মাসিক পত্রিকা থেকে গল্প পড়ে শোনাবার লোক দরকার হলে, ছোট রবির ডাক পড়ত। কিশোবী চাটুয্যে সমস্ত বামায়ণের পাঁচালি সুর করে মুখস্থ শোনাত।

তাবপর বাড়িতে সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথ যে কতকগুলো নিয়ম বেঁধে দিয়েছিলেন, তারমধ্যে একবার পড়ে গেলে কারো পক্ষে মুখ্যু থাকাই ছিল অসম্ভব। সারাদিনের মধ্যে থেকে স্কুল তো অনেকটা সময় নিয়ে নিত, কিন্তু বিদ্যাশিক্ষার তালিকাতে সেইটুকুই সব নয়। শিক্ষা শুরু হত ভোরে। ঘুম থেকে উঠেই বাড়িব মধ্যে আখড়া-বাড়িতে শহরের এক ডাকসাইটে পালোয়ানের কাছে কুস্তি শিখতে হত। রবীন্দ্রনাথের মায়ের আবাব ছিল ভাবি ভয়, কাদা মেখে ছেলে যদি কালো হয়ে যায়, তাই ববিবারে তাকে বাদাম-বাটা, সর ইত্যাদি মাখাতে বসে যেতেন।

কুস্তির পর চলত মেডিকেল কলেজের এক ছাত্রের কাছে অস্থি-

বিদ্যা শেখা, একটা সত্যিকার মানুষের কঙ্কাল দেখে দেখে। তাইতে হাড়গোড়ের ভয় গেল ভেঙ্গে। তারপর সকাল সাতটা বাজতেই নীলকমল মাস্টারের কাছে বাংলায় অঙ্ক শেখা। তা ছাড়া বাংলা সাহিত্য, বিজ্ঞান, সংস্কৃত।

স্কুল থেকে ফিরেও রেহাই ছিল না। প্রথমে জিমনাস্টিকের মাস্টাব, তাবপর ছবি আঁকার মাস্টাব, তারপর সন্ধ্যে হলে অঘোর মাস্টারের কাছে ইংবেজি পডা। এত সবেব মাঝখানে মুখ্যু হয়ে থাকবাব জো ছিল কোথায় ?

তবে পালিয়ে বেড়াবার আরেকটা সহজ উপায়ও আছে, সেটা হল কল্পনাব ঘোড়ায় চেপে। ও বাড়িতে চাকবদের মহলকে বলা হত তোষাখানা। তারই কাছে ছিল পড়ে একটা রঙ-চটা পুবনো পালকি; দেখেই বোঝা যেত যে এককালে তাব বাহার ছিল কত। এখন অবিশ্যি তার গদি ছিঁড়ে নাবকেলের ছোবড়া গেছে বেরিয়ে। কিন্তু দরজা দুটো টেনে দিলে সেই আধ অন্ধকারে একলা বসে মনে মনে কোথায় যে না যাওয়া যেত তার ঠিক কি! গভীব রাত্রে, তেপান্তরের ওপারে, নির্জন বনপথে ডাকাতদের সঙ্গে লড়াই হোক, কি সমুদ্রের বুকে নৌকাযাত্রাই হোক, কোনো কিছুতেই বাধা ছিল না।

তাছাড়া কতকগুলো কাঠের রেলিং ছিল, সেগুলোকে লেখাপড়া শিখিয়ে খানিকটা মনের জ্বালা দূর করা যেত। কতকগুলো রেলিং আবার এমনি দুষ্টু ছিল যে সেগুলোকে আচ্ছা করে না পিটিয়ে উপায় ছিল না। এমনি বেদম মার খেত তারা যে শেষ পর্যন্ত ঢিলে হয়ে খুলে আসে আর কি! তবে তাতে করে তাদের স্বভাব না বদলালেও স্কুলে যাবার দুঃখ খানিকটা কমে যেত।

রবি মাঝে মাঝে খোলা ছাদে একলা চলে যেত। গিয়ে দেখত দূরে যেখানে আকাশের সঙ্গে পৃথিবী গিয়ে মিশেছে, সেই পর্যন্ত শুধু ছাদের পর ছাদ! আর মাথার ওপরে নীল আকাশে মেঘ ভাসছে, চিল উড়ছে।

হাত গলিয়ে খিল খুলে বাবার স্নানের ঘরে ঢোকাতেও কোনো বাধা ছিল না। বাবা বেশির ভাগ সময়ই বাইরে বাইরে ঘুরতেন। ততদিনে কলকাতা শহরে জলের কল বসে গেছে, নির্জন দুপুরে বাবার নাইবার ঘরের কলে আরেকবার স্নান করার সে যে কি আরাম! তারপর পা ছড়িয়ে বাবার আরাম-কেদারায় শুয়ে শুয়ে যা ইচ্ছে তাই ভাবা যেত।

চারদিকে সাধারণ জীবনযাত্রা চলতে থাকে, দেউড়িতে দারোয়ানরা ডন বৈঠক কষে; সওদা নিয়ে ঝি উঠোন পাব হয়ে আসে; অন্দরের ছোট ছাদে বাড়ির মেয়ে বউরা আচার শুকোয়, আমসত্ব দেয়, বড়ি দেয়; বারান্দার কোণে নেয়ামৎ আলি দরজি জামা ছাঁটে; পথ দিয়ে ফেরিওয়ালারা বেলফুল হেঁকে যায়; চুড়িওয়ালার, কুলপি বরফওয়ালার ডাক শোনা যায়। এত সবের মাঝখানে ছোট রবীন্দ্রনাথ একদিন বিশ্বকবির আসন নেবেন বলে আস্তে আস্তে নিজেরই অজ্ঞাতসারে তৈরি হতে থাকেন।

একটু একটু করে বড় হতে থাকেন, ফুলের মত ধীরে ধীরে মনের পাপড়িগুলোও খুলতে থাকে। বাড়িতে বিষ্ণু বলে গানের মাস্টার দিশী গানে হাতে-খড়ি দিয়েছিলেন সেই কোন ছোটবেলায়। এখন একবার দুবার শুনলেই যে কোনো গান গলায় এসে যায়, পরে মেয়েদের আড্ডায় শুনিয়ে দিয়ে মায়ের কাছে খুব সহজে বাহবা পাওয়া যায়। বাড়িতে সারাদিন গানের হাওয়া বয়।

ওঁদের বাড়ির বন্ধু ছিলেন শ্রীকণ্ঠবাবু, যেমনি তাঁর গলা ছিল. তেমনি গানে অনুরাগ। গান তো শেখাতেন না, মনে হত গানগুলো দিয়ে দিচ্ছেন, নিজের অজানতেই শেখা হয়ে যেত।

আরেকটু বড় হলে বিখ্যাত ওস্তাদ যদুভট্টও ওঁদের বাড়িতে কিছুদিন ছিলেন, কিন্তু কারো কাছে নিয়ম করে গান শেখা কবির ধাতে সইত না। লুকিয়ে চুরিয়ে কিছু কিছু শিখে নিয়েছিলেন, সেইগুলোই নাকি

ওঁর বর্ষার গানের সঙ্গে এখনো দল বেঁধে থেকে গেছে' এমনি করে গলায় সুর এসে গেল, গানের কান খুলে গেল।

এই গানের মধ্যে দিয়েই পরে এক সময় বড়দের রাজ্যে চলেছিল ছেলেমানুষ রবীন্দ্রনাথের যাওয়া আসা। বারো বছরের বড় দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পিয়ানোতে ঝমাঝম বিলিতি সুর বাজিয়ে রবিকে বলতেন কথা বেঁধে দিতে। সন্ধ্যেবেলায় ছাদের উপর ছোটখাটো একটি আসর বসে যেত। কিন্তু তার আগে আরো অনেকগুলো ঘটনা ঘটে গিয়েছিল। তার মধ্যে প্রধান হল বাবাকে কাছে পাওয়া।

অনেক দিন আগে বাবাকে একবার ছোট্ট রবি চিঠি লিখেছিল। বাবা তখন হিমালয়ে ভ্রমণ করছেন, এমন সময় গুজব উঠল হিমালয় পেরিয়ে রুশেরা নাকি ভারতবর্ষকে আক্রমণ করবে। রবির মায়ের হল ভারি ভয়, কর্তা যে আবার ওই হিমালয়েই গেছেন। ভয়টা বড়দের কাছে বলতে হয়তো লজ্জা পেয়েছিলেন, তাই ছোট্ট রবিকে ধরে এক চিঠি লেখালেন। বাড়িতেই সেরেস্তা, সেখানকার একজন কর্মচারীর সাহায্যে যথাযোগ্য সম্বোধন শিরোনামা দিয়ে চিঠি লেখা হল। তার উত্তরও এল। বাবা লিখলেন, রবি যেন কোনো ভাবনা না করে, রুশেরা এলে তিনি নিজের হাতে তাদের তাড়িয়ে দেবেন। চিঠি পেয়ে ছেলে আনন্দে আত্মহারা।

হঠাৎ সেই বাবাকে একেবারে হাতের নাগালের মধ্যে পাওয়া গেল। এগারো বছর দশ মাস বয়সে মহর্ষি এসে রবীন্দ্রনাথের পৈতে দিলেন। পৈতের পর নেড়া-মাথার উপর ঘোর অনিচ্ছা সত্ত্বেও টুপি চাপিয়ে বাবার সঙ্গে রবি হিমালয় ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ল। স্কুলের পড়া রইল শিকেয় তোলা। আগ্রহে অধীর হয়ে বাবার সঙ্গে এই প্রথম রবি ট্রেনে চাপল। পাহাড়ে যাবার আগে কদিন শান্তি-নিকেতনে থাকা হবে।

ট্রেনে চাপতে গিয়ে দেখা গেল যে ব্যাপারটাকে যতটা কঠিন বলে

সত্যর মুখে শোনা গিয়েছিল, আসলে তার কিছুই নয়। সে তো বলেছিল নাকি প্রাণ হাতে করে রেলগাড়িতে চড়তে হয়। আরো বলেছিল যে শান্তিনিকেতনে একটা আশ্চর্য রাস্তা আছে, সেটার উপর ছাদটাদ নেই, তবু সেখান দিয়ে হাঁটলে গায়ে রোদও লাগে না, বৃষ্টিও লাগে না। সেই পথটিও রবি কত খুঁজেছিল কিন্তু পায় নি।

তার বদলে পেয়েছিল বাবাকে খুব কাছাকাছি। তাঁর সঙ্গে খোয়াইয়ের মধ্যে বেড়িয়েছিল। লাল মাটি ক্ষয়ে গিয়ে ঠিক মনে হয় তার পাঁজরা বেরিয়ে পড়েছে, তাকেই বলে খোয়াই। তার মধ্যে গাছপালা বিশেষ হয় না, খালি কয়েকটা কাঁটা-ঝোপ, খেজুর গাছ আর মনসা গাছ।

বর্ষায় খোয়াইয়ের মাঝখান দিয়ে জলেব ধাবা বয়ে যায়, ছোট ছোট ঝরণা তৈরি হয, এখানে ওখানে জল জমে থাকে, তার মধ্যে খুদে খুদে মাছ সাঁতবে বেড়ায়। খোয়াইএ নেমে নানাবকম সুন্দর নুড়ি আর পাথব কুড়নো যায়। সেই খোয়াই দেখে ববির কি আনন্দ! পাথব কুডিয়ে বাবাকে দেখালে বাবাও কত খুশি হন!

শান্তিনিকেতনে এসে ববিব মন যেন ছাড়া পেল, এখানকার খোলা মাঠ আব নীল আকাশ তাকে মুগ্ধ কবল। তখনো ঘববাড়ি বিশেষ কিছু হয় নি। শোনা যায় গোরুব গাডিতে কবে মহর্ষি একবাব বায়পুবেব সিংহদেব বাড়িতে যাবাব সময় নিজন মাঠেব মধ্যে ছুটি ছাতিম গাছ দেখে বড় খুশি হযেছিলেন, বলেছিলেন এখানে বড় ভালো সাধনাব জায়গা হয়।

পবে ওইখানে খানিকটা জমি তিনি দান গ্রহণ করেন, তার উপব দোতলা একটি বাড়ি, কুয়ো ইত্যাদি তৈবি হয়। সেই হল এখনকার বিশাল শান্তিনিকেতনের প্রথম বাড়িঘব। মহর্ষি ও তাঁব বন্ধুরা মাঝে মাঝে এসে ছু চাব দিন থেকে ভগবানের সাধনা করে যেতেন। রবিব এই প্রথম আসা।

জোড়াসাঁকোয় একদিন দুপুরে যখন সবাই ঘুমচ্ছে কিংবা কাজে ব্যস্ত আছে, তখন রবি তার দাদাদের বহুমূল্য পোষা পাখিদের বন্দী অবস্থা সইতে না পেরে সবাইকে ছেড়ে দিয়েছিল। তেমনি কলকাতার ইট কাঠের খাঁচা থেকে নিজেও আজ যেন মুক্তি পেল। আর সমস্ত খেলাধূলো আনন্দোচ্ছ্বাসের মধ্যে অসাধারণ বাবাকে সঙ্গী ও উৎসাহ-দাতারূপে পেয়ে যেন হাতে চাঁদ পেল।

শান্তিনিকেতনের খোলা আকাশের নিচে কিছুদিন কাটাবার পর ওঁরা গেলেন হিমালয়ের দিকে। কয়েক মাস নানান জায়গায়, অমৃতসর, ড্যালহৌসি, বক্রোটা ঘোরা হল। তাবপর মহর্ষি থেকে গেলেন, কিশোরী চাটুয্যের সঙ্গে রবি আবার কলকাতায় ফিরে এল।

দেখা গেল এই মাসেই রবির মধ্যে মস্ত একটা পরিবর্তন হয়েছে। তার সেই ছেলেমানুষী ঘুচে গিয়ে, কেমন একটা দায়িত্ব-বোধের ভাব এসেছে। তার কারণও যথেষ্ট ছিল। বাবার সঙ্গে থাকার সময় যেমন ইচ্ছা মতন ঘুরে বেড়াবার অবাধ স্বাধীনতা ও পেয়েছিল, তেমনি বাবার নিজের পরিকল্পিত একটা নিয়মেব মধ্য থেকে, মনে একটা দৃঢ়তা ও শৃঙ্খলা এসে গিয়েছিল।

বাবা সময়নিষ্ঠা ভালবাসতেন, ভোরে উঠে দিনের কাজ শুরু করতে হত। বেড়ানোর শেষে ঠাণ্ডা জলে স্নান, গীতা থেকে অনুলিপি করা, ইংরেজি পড়া, বিজ্ঞান ও সংস্কৃত চর্চা, সবই চলতে থাকত। বাবার দামী ঘড়িতে মনে করে দম দিতে হত, ক্যাশ বাক্সের হিসেব রাখতে হত। এ কাজে রবিব বেশ দক্ষতা দেখা গেল। একদিন তো তহবিলের হিসেব কমে না গিয়ে বেড়েই গেল! মহর্ষি হেসে বললেন, রবিকে জমিদারির হিসেব রাখার কাজ দিলে তো লাভের আশা আছে!

দূরের বাবা একেবারে বুকের কাছে এসে গেলেন! কত শিক্ষা, কত সরস সব গল্প রসিকতা তাঁর কাছ থেকে পাওয়া গেল। তিনি

নিজেই যেন একটি জীবন্ত অনুপ্রেরণা ; তাঁর ভোরে উঠে উপাসনা, গভীর রাতের সাধনা, রবির মনে সারাজীবন ছবির মত আঁকা হয়ে রইল। যেন পরশ পাথরের ছোঁয়া লেগে সোনা হয়ে রবি ফিরে এল জোড়াসাঁকোতে। এতদিন পরে বাড়ির লোকে তাকে একটা গোটা মানুষ বলে মেনে নিল।

তবে বয়স তো খুব বেশি হয় নি, কাজেই নতুন শেখা বিদ্যাগুলো মেয়েদের কাছে জাহির করে মায়ের প্রশংসা পাওয়ার লোভটা কিছুতেই সামলানো যায় নি।

পুরনো স্কুলেও আর কুলোল না, এবার ববিকে সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুলে ভরতি করা হল। সেখানকার অনেক সুখ দুঃখের কথাও পরে তিনি অনেক বলেছেন। কিন্তু সেখানেও মন বসবার মত কিছু পাওয়া গেল না।

এদিকে কবিতা লেখা অনেক দিন আগেই শুরু হয়েছিল। মনের মধ্যে কবিতার লতাগাছটি দিনে দিনে অনেকখানি বেড়েও উঠেছিল, মাঝে মাঝে তাতে ছোট ছোট কুঁড়িও ধরত, আবার ঝরে যেত।

রবিব যখন সাত আট বছর বয়স, তখন তার চেয়ে বয়সে বড় এক ভাগ্নে, জ্যোতিপ্রকাশ তাব নাম, একদিন দুপুর বেলায় তাকে ডেকে নিয়ে পয়ার ছন্দে চোদ্দ অক্ষরে যোগাযোগ করে কেমন কবিতা হয়, এই রহস্যটি শিখিয়ে দিয়ে বললে, এবার তোমাকে কবিতা লিখতে হবে।

একটু চেষ্টা করতেই রবির হাত দিয়ে কবিতা বেরিয়ে পড়ল। তখন তার উৎসাহ কে দেখে! সোমেন্দ্রনাথ হয়ে উঠলেন একজন ভক্ত! রবির লেখা কবিতা একে ওকে, বাড়ির আমলাদের, অভ্যাগতদের শোনানো হতে লাগলো। ছোট্ট একটি নীল কবিতার খাতার পাতা ক্রমে ভরে উঠে রবির পকেটে ঘুরতে লাগল। কবি বলে সঙ্গী সাথীদের মধ্যে খ্যাতি হল।
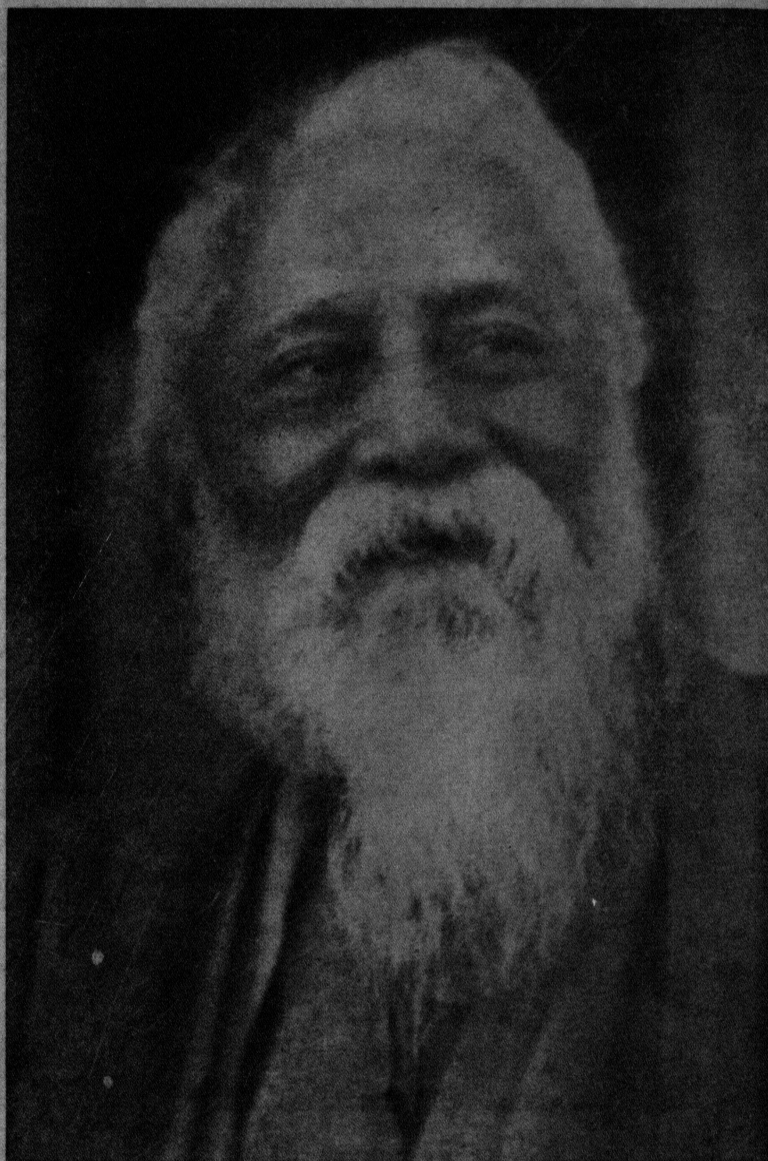
রবীন্দ্রনাথ

[বিশ্বভারতীর সৌজন্যে]

রবীন্দ্রনাথের কন্যাগণ ও কনিষ্ঠ পুত্র

মধ্যস্থলে উপবিষ্ট জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতা, পশ্চাতে দণ্ডায়মান মধ্যমা কন্যা রেণুকা
দক্ষিণে দণ্ডায়মান কনিষ্ঠা কন্যা মীরা, বামে দণ্ডায়মান কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথ

[বিশ্বভারতীর সৌজন্যে]

সেই খ্যাতি কেমন করে স্কুলের মাস্টারমশাইদের কানেও পৌঁছেছিল, তাঁরা ফরমায়েস করে রবিকে দিয়ে কবিতা লিখিয়ে নিতেন। ভক্তের সংখ্যাও বাড়ছিল, ঈর্ষা করবার লোকের অভাব হচ্ছিল না। বাড়িতে শ্রীকণ্ঠবাবুও ভারি খুশি, উৎসাহের চোটে রবির লেখা কবিতা তিনি স্বয়ং মহর্ষিকে দেখিয়েছিলেন। সংসারের দাবদাহে তাঁর ছোট ছেলেটি কেমন জর্জরিত, পয়ার ছন্দে সে কথা পড়ে মহর্ষি নাকি হেসেছিলেন। বহুকাল পরে—

'নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে
রয়েছ নয়নে নয়নে'

এই গানটি বাবাকে শুনিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর চোখে জল এনে আর তাঁর হাত থেকে পুরস্কার নিয়ে, ছোটবেলাকার এই অবহেলার প্রতিশোধ নিয়েছিলেন।

প্রথম কবিতা লেখার ওই কাহিনীটি হিমালয় যাবার অনেক আগের ঘটনা। ততদিনে রবির কাব্যপ্রতিভা আরও অনেক বলিষ্ঠ হয়ে উঠেছে, তবে এখন পর্যন্ত সে সাধনা অনেকখানি গোপনেই চলছিল। হিমালয় থেকে ফিরে 'অভিলাষ' নামে তাঁর একটি কবিতা 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকাতে প্রকাশিত হল, তবে তাতে তাঁর নাম ছিল না। কবিতাটি এই ভাবে শেষ হয়েছিল :—

'জন মনোমুগ্ধকর উচ্চ অভিলাষ,
তোমার বন্ধুর পথ অনন্ত অপার,
অতিক্রম করা যায় যত পান্থশালা,
তত যেন অগ্রসর হতে ইচ্ছা হয়।'

এবার তাঁর জীবনে একটা মস্ত বড় দুঃখ এল। রবির বয়স যখন তেরো বছর দশ মাস, তার মায়ের মৃত্যু হল।

তৃতীয় অধ্যায়

কিছুদিন রোগে ভুগে মা যখন মারা গেলেন, তখন গভীর রাত, ছোট ছেলেরা সব ঘুমিয়ে। সকালে তাঁর সুন্দর করে সাজানো দেহটা দেখেও মৃত্যুর নির্মমতা সম্বন্ধে রবির তেমন কোনো ধারণা হয় নি। স্নেহময়ী দিদি বউদিরা সে দিন থেকে তাকে বুকে তুলে নিয়েছিলেন। শ্মশান থেকে ফিরে এসে বাবার ঘরের দিকে চেয়ে দেখেছিল রবি, বাবা তাঁর ঘরের সামনে বসে ভগবানের উপাসনা করছেন। এ কথা কবির চিরকাল মনে ছিল।

কোনো মানুষ সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে জন্মায় না, কতকগুলো দোষগুণ নিয়ে এলেও, তিলে তিলে তার মনটা তৈরি হয়। যাদের সঙ্গে মেলামেশা, যেখানে বাস, যে কথা শোনা, যে রূপ দেখা, সবই তার মনের মধ্যে কিছু কিছু রেখে যায়। রবীন্দ্রনাথের বড় সৌভাগ্য যে এমন জায়গাটিতে পড়লেন, যাতে তাঁর মনের কবিতা-লতাটি ক্রমে ক্রমে পাতায়, কুঁড়িতে, ফুলেতে বিকশিত হয়ে উঠতে যা যা দরকার হয়, একে একে সবই পেয়েছিল।

বাড়ির গান বাজনা সাহিত্যচর্চার কথা তো বলাই হয়েছে। তার উপর দেশপ্রেম ছিল তাঁদের সুগভীর। কোথায় ভালো দিশী জিনিস আছে, সবেতেই তাঁদের উৎসাহ। যাত্রাগান, লোক-সংগীত, দিশী নাচ কবি-লড়াই এ সবেতে তাঁদের আগ্রহ তো ছিলই। দিশী জিনিসকে উৎসাহিত করতে গিয়েও অনেক সময় চিন্তা ও অর্থ অকাতরে খরচ করতেন। বিদেশীর চোখে যাতে দেশের সম্মান ক্ষুণ্ণ না হয় সে বিষয় তাঁরা সচেতন ছিলেন। তার ফলে তাঁদের বাড়িতে একটি বলিষ্ঠ স্বাদেশিকতার আবহাওয়া বিরাজ করত।

মজার ঘটনাও ঘটত। সঞ্জীবনী সভা বলে তাঁদের গুপ্ত সভা

থেকে স্বাদেশিকতার নাম নিয়ে এখানে ওখানে চড়াইভাতি হত। তা ছাড়া ছিল 'হিন্দুমেলা', সে এক অপূর্ব ব্যাপার। নবগোপাল মিত্র বলে একজন ছিলেন তার কর্মকর্তা; রাজনারায়ণ বসু, কবির খুড়তুতো ভাই গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি পৃষ্ঠপোষক। ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলে ভক্তির সঙ্গে বুঝতে চেষ্টা করা এই হয়তো প্রথম। দাদারা দেশপ্রেমের গান বাঁধতেন, দিশী শিল্প ব্যায়াম ইত্যাদির প্রদর্শনী হত, গুণীদের পুরস্কার দেওয়া হত।

পনেরো বছর বয়সেই হিন্দুমেলায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম দেশপ্রেমের কবিতা পাঠ করেন। কবি নবীন সেন সে কবিতা শুনেছিলেন। তার বছর দুই পরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা দেশপ্রেমের নাটক 'সরোজিনী'র জন্যও রবীন্দ্রনাথ একটা গান লিখে দিয়েছিলেন। এমনি করে নিঃশব্দে এসে তরুণ কবি কাব্যলক্ষ্মীর সভায় ছোট একটি আসন জুড়ে বসলেন। এখানে ওখানে 'ভারতী'তে, 'জ্ঞানাঙ্কুরে', একটি দুটি রচনা প্রকাশিত হতে লাগল। তার মধ্যে 'কবি-কাহিনী'র কথা এখনো আলোচিত হয়ে থাকে। তবে সব চাইতে বিস্ময়কর হল তাঁর 'ভানুসিংহের পদাবলী'। সেকালের পদাবলীর অনুকরণে, ভানুসিংহ ঠাকুর রচয়িতা বলে এই কবিতাগুলো প্রকাশিত হল। পরে লেখকের নাম ও বয়স শুনে পাঠকরা বিশ্বাস করতে চাইল না যে এগুলি একটি ষোল বছরের ছেলের লেখা। আজ পর্যন্ত লোকে কত আদর করে 'ভানুসিংহের পদাবলী' পড়ে।

অনেকে ভাবে কবিরা বুঝি শুধু ভাব নিয়ে থাকেন, যুক্তিতর্কের ধার ধারেন না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সবল প্রতিভার মধ্যে সেরকম দুর্বলতার স্থান ছিল না। অল্প বয়স থেকেই অন্যায়ের প্রতিবাদে সাময়িক সাহিত্যের সমালোচনায় তাঁর যুক্তি দিয়ে তর্ক করবার ক্ষমতা প্রকাশ পেয়েছিল। পরে জমিদারির কাজেও তাঁর আশ্চর্য মেধার পরিচয় পাওয়া যেত।

কিন্তু হলে হবে কি! বাড়ির অভিভাবকরা শুধু তাঁর ওই সাহিত্যের নবীন খ্যাতি নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন না। এখনো তাঁদের বড় আশা ছেলেটা হয়তো লেখাপড়া শিখে বড় একটা পদ অলংকৃত করবে। এই আশা নিয়ে সতেরো বছর বয়সে, মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তাঁকে বিলেত পাঠানো হল।

ওই রকম সাদাসিধে ভাবে মানুষ হওয়া ছেলেকে বিলেত পাঠাবার আগে খানিকটা কায়দাতুরস্ত করে নেওয়া দরকার, এ কথা সকলেরই মনে হয়েছিল। সত্যেন্দ্রনাথ তখন আমেদাবাদে। তাঁর স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে বিলেতে, তাদের কাছেই রবীন্দ্রনাথ গিয়ে উঠবেন, এই রকম ব্যবস্থা হল। আপাততঃ তাঁকে আমেদাবাদে পাঠানো হল। সেখানে পুরনো একটা প্রাসাদে, যার পায়ের কাছ দিয়ে সবরমতী নদী বয়ে চলেছে, সেইখানে থাকাকালে কি রকম একটা গভীর আকুলতায় তাঁর মনকে পেয়ে বসল। এইখানেই 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পটি তাঁর মনের মধ্যে কুঁড়ি ধরেছিল, যদিও লেখা হয়েছিল পরে।

আমেদাবাদে প্রবাসের কালটা দেশী বিদেশী বই পড়ে কেটেছিল, বিশেষ করে ইংরেজি সাহিত্য। কি একটা বই পড়ে 'ইংরেজদিগের আদবকায়দা' নামে একটা প্রবন্ধ লিখে, 'ভারতী'তে ছাপালেন। এমনকি বাংলা ভাষায় ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস লিখবার ইচ্ছায় বিস্তব পড়াশুনাও করতে লাগলেন। ক্রমে ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় অনেকটা ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। পাঁচরকম দেখে নিজের কলমেও একটা জোর এল।

বাংলা বই ভালো মন্দ উপায়ে মেলা পড়েছিলেন সেই শৈশব থেকেই। একে বাড়িতে বাংলা শিক্ষার ভারি একটা আগ্রহও ছিল, মাস্টারমশাইরাও ছিলেন, তা ছাড়া বারণ না মেনে, লুকিয়ে চুরিয়ে, বড়দের আঁচল থেকে বইয়ের আলমারির চাবি খুলে নিয়ে, কত যে বোধ্য ও দুর্বোধ্য বাংলা বই, পত্রিকা পড়ে শেষ করেছিলেন, তার

হিসেব রাখা যায় না। মনের ভিতরটা যেন একটা চষা মাঠের মত হয়ে উঠেছিল, তার মধ্যে সাহিত্যের একটু বীজ পড়লেই চারদিক শ্যামল সবুজ হয়ে ওঠে।

আমেদাবাদ থেকে বোম্বাই গেলেন, এক সম্ভ্রান্ত পারসী পরিবারে থেকে ইংরেজি বলা-কওয়া সড়গড় করে শেখার অভিপ্রায়ে। এখানে একজন পারসী মেয়ের বিদ্যা ও লাবণ্যরাশি তাঁর মনে একটা গভীর রেখাপাত করেছিল। তাকে উৎসর্গ করে কত সুন্দর সুন্দর গান ও কবিতা রচনা করেছিলেন। তার নাম দিয়েছিলেন নলিনী, বড় রূপবতী গুণময়ী মেয়ে ছিল সে, অকালে তার মৃত্যু হয়।

শেষ অবধি বিলেতে গিয়ে পৌঁছলেন, সোজা ব্রাইটন শহরে, একেবারে মেজবউঠাকুরুণ জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, তাঁর ছোট ছেলে সুরেন্দ্রনাথ ও আরও ছোট মেয়ে ইন্দিরা যেখানে বাস করছিলেন সেখানে। ছোট ছেলেমেয়ের সঙ্গে গভীরভাবে মিশবার সুযোগ এই প্রথম, এর ফলে কাকা ও ভাইপো ভাইঝির মধ্যে যে স্নেহের সম্বন্ধ গড়ে উঠল, সেটা আজীবনের সম্পদ হয়ে ছিল।

ছোট শহর ব্রাইটন, সেখানকার একটা পাবলিক স্কুলে ভরতি হয়ে, ইংরেজ সমাজে নাচ গান আমোদ আহ্লাদে রবীন্দ্রনাথ আনন্দের সঙ্গে যোগ দিলেন। বেশ ছিলেন সেখানে, এমন সময় মেজদাদার বন্ধু ব্যারিষ্টার তারকনাথ পালিত এসে সব দেখে শুনে বললেন, এখানে রবির না হবে পড়াশুনা না চিনবে বিলেত দেশটা। এই বলে সেখান থেকে ছাড়িয়ে তাঁকে লণ্ডনে নিয়ে গিয়ে, একটা বাসাবাড়িতে একলা বসিয়ে দিয়ে, লণ্ডন য়ুনিভার্সিটি কলেজে ভরতি করে দিলেন। তারকনাথের ছেলে লোকেনও সেখানে তখন, দুজনের মধ্যে ভারি একটা অন্তরঙ্গতা হয়ে গেল।

লণ্ডনে বিখ্যাত সাহিত্যিক মর্লির কাছে পড়েছিলেন, রাষ্ট্রনেতা গ্ল্যাড্‌ষ্টোন ইত্যাদির বক্তৃতা শুনেছিলেন। সমুদ্রের ধারে বসে 'ভগ্ন-

তরী' নামে একটা লম্বা দুঃখের কবিতা লিখেছিলেন। এরই মধ্যে আবার 'ভারতী'তে ধারাবাহিকভাবে চিঠি প্রকাশ করতে লাগলেন, তাতে ইঙ্গ-বঙ্গদের যেমনি নিন্দা, ইংরেজ সমাজের গতিশীল জীবনের প্রচণ্ডতা ও স্বাধীনতার তেমনি প্রশংসাও থাকত। এইসব চিঠি পড়ে কলকাতার গুরুজনরা অনেকেই চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথকে দেশেই ফিরে আসতে হল। কিন্তু বিলেতের এই দেড়টা বছর তাঁর স্বভাবে ও মতামতে অনেক পরিবর্তন এনে দিয়েছিল।

দেশে ফেরবার দেড়বছর পরে ওই চিঠিগুলি 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' নামে বই হয়ে বেরোয়। এই বইয়ের ভাষার একটা বৈশিষ্ট্য ছিল যে যদিও তখন চিঠিপত্রেও সাধু ভাষা ব্যবহার হত, এই চিঠিগুলি একেবারে চলতি ভাষায় লেখা। বইতে এ রকম ভাষার চল তখন ছিল না বললেই হয়।

রবীন্দ্রনাথ বিলেত থেকে কিছু পাস করে এলেন না বলে অনেকে নিরাশ হলেও, সকলে স্বীকার করলেন তাঁর চালচলনের অনেক উন্নতি হয়েছে। আগেকার সেই লাজুক ভাবটা চলে গেছে, কথাবার্তা সহজ সুন্দর হয়েছে, বিলিতি একটা চাকচিক্য এসেছে, মিষ্টিগলায় চমৎকার বিলিতি সব গান গাইতে পর্যন্ত শিখে এসেছেন। দেশে এসে রবীন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের গানের দলে ভিড়ে গেলেন। তাঁরা দেশী বিদেশী সুরের সঙ্গে বাংলা কথা জুড়ে গাইতেন। এতদিন অক্ষয় চৌধুরী কথা জোগাতেন এখন রবীন্দ্রনাথও সঙ্গে জুটলেন।

ছাদে ভারি চমৎকার আসর বসত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী কাদম্বরী দেবী নানান গুণে ভূষিতা ছিলেন, বয়সে রবীন্দ্রনাথের চাইতে সামান্য বড়, তাঁর স্নেহ ছিল কবির জীবনের একটা সম্পদ। বড়ই অল্প বয়সে এর কয়েক বছর পরেই তাঁর মৃত্যু হয়। সে দুঃখ সারাজীবন কবির মনকে পীড়া দিত।

যতদিন বিলেতে ছিলেন, যে কারণেই হোক, রবীন্দ্রনাথ বেশি

কবিতা রচনা করেন নি, তবে অনেক গদ্য প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখেছিলেন। 'ভগ্নহৃদয়' বলে একটা কাব্য শুরু করেছিলেন, দেশে এসে শেষ করেন।

যাঁরাই কবির জীবনী নিয়ে চিন্তা করেছেন, তাঁরাই লক্ষ্য করেছেন, যে তাঁর এক রকমের মনোভাব বেশি দিন থাকত না, বারে বারে যেন পট পালটাত, একেক সময়ে একেক ধরনের লেখা নিয়ে মেতে উঠতেন।

দেশে ফেরার এক বছর পরে 'বাল্মীকি-প্রতিভা', কবির প্রথম গীতিকাব্য রচিত হয়। ইতিমধ্যে গোটা আষ্টেক ভগবানের গান লিখেছিলেন। 'বাল্মীকি-প্রতিভা' লেখার আবার এক গল্প আছে। ওঁদের বিদ্বজ্জন সমাগম সভা বলে একটা সমিতি ছিল; সেখানকার একটা অধিবেশনে অভিনয় করা হবে বলে, বিহারীলাল চক্রবর্তীর 'সারদামঙ্গল' কাব্য থেকে, রত্নাকর দস্যুর বাল্মীকি মুনি হবার কাহিনী থেকে খানিকটা নিয়ে, এই গীতিনাট্য রচনা হয়। অবশ্য খানিকটা অদল-বদলও ছিল এতে। আগাগোড়া গানে লেখা এই অপূর্ব নাটিকার সমাদর আজ প্রায় আশি বছর হতে চলল, এখনো এতটুকু ম্লান হয় নি। এর মধ্যেও দু তিনটি গানে বিলিতি সুর দেওয়া হয়েছে।

যাই হোক বিদ্বজ্জনদের সামনে তো এই নাটকের অভিনয় হল, রবীন্দ্রনাথ নিজে সাজলেন বাল্মীকি, তাঁর ভাইঝি অতিশয় গুণী প্রতিভাদেবী সাজলেন সরস্বতী। বহু গণ্যমান্য দর্শক, বহু নামকরা সাহিত্যিক অভিনয় দেখলেন; বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, আরও কত নামকরা লোক এসেছিলেন: একজন, কুড়ি বছরের ছেলে, এই একটি নাটক দিয়ে নাট্যাভিনয়ের ইতিহাসে এক নূতন যুগ এনে দিয়েছিলেন। এখন যত গীতিনাট্য শোনা যায়, তাদের প্রথম সূচনা হয়ে গিয়েছিল সেই দিনই।

'বাল্মীকি প্রতিভা'র প্রায় দু বছর পরে আরেকটি গীতিনাট্য 'কালমৃগয়া' রচনা হল, অভিনয় হল। এর গল্প হল দশরথ আর অন্ধ-মুনির ছেলের কাহিনী থেকে নেওয়া। তবে শুধু গান আর নাটক

নিয়ে রবীন্দ্রনাথ এ সময়টা কাটান নি, এই সময়ই প্রথম তিনি সাধারণ শ্রোতার সামনে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, বক্তৃতার বিষয় ছিল ভাব ও সংগীত।

১৮৮১ সালে রবীন্দ্রনাথ আরেকবার বিলেত যাবার জন্যে রওনা হয়েও মাদ্রাজ অবধি গিয়ে ফিরে এলেন। অল্প দিন পরেই তাঁর 'সন্ধ্যা সংগীত' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হল। এ ধরনের ছোট কবিতা, যাতে সুর দেওয়াও চলে, ইংরেজিতে অনেক থাকলেও, বাংলায় বিশেষ ছিল না।

তারপর কিছুদিন মুসৌরিতে বাবার কাছে, কিছুদিন চন্দননগরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাছে কাটিয়ে, কলকাতায় এসে সদর স্ট্রীটে ওঁদেরই কাছে উঠলেন। একদিন সকালে বারান্দায় দাঁড়িয়ে পুব দিকে চেয়ে দেখেন গাছের পাতার আড়ালে সূর্য উঠছে আর সমস্ত পৃথিবী যেন কি একটা অপরূপ সৌন্দর্যে জড়িয়ে গভীর আনন্দে মগ্ন হয়ে রয়েছে। অমনি মনে হল, চোখ থেকে একটা কালো পরদা সরে গেল, নতুন করে জগৎকে দেখতে পেলেন।

সেইদিনই 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি লিখলেন। এ কবিতা যে পড়ল সেই বলল এত দিনে কবি নিজেকে বুঝতে পেরেছেন। এখন থেকে আর তাঁর লেখার মধ্যে কোনো অনিশ্চয়তা দেখা যায় নি, তাঁর জীবনটাই যেন যেদিকে আলো সেই দিকেই একটা মোড় নিল।

এই অপূর্ব কবিতাটি 'প্রভাত সংগীতে'র শ্রেষ্ঠ কবিতা।

বাইশ বছর বয়সে যশোরের বেণী রায়চৌধুরীর মেয়ে ভবতারিণী দেবীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিবাহ হল। শ্বশুর বাড়িতে ওই নাম বদলে মৃণালিনী রাখা হল। মহর্ষিই বিবাহ স্থির করলেন। ওঁদের বাড়িতে সব অনুষ্ঠানেই যেমন হত, সমস্ত ব্যবস্থার খুঁটিনাটিও ঠিক করে দিলেন। কিন্তু নিজে উপস্থিত থাকতে পারলেন না। নদীপথে বেড়াতে বেড়াতে বাঁকিপুর অবধি এসে খবর পেলেন, তাঁর বড় আদরের বড় জামাই

সাবদাপ্রসাদেব মৃত্যু হয়েছে। সেই দিনই ববীন্দ্রনাথেব বিয়ে, মহর্ষিব আব আসা হল না। সোজা বোলপুব চলে গেলেন।

বাড়িব ছোট ছেলেব বিয়ে হল, সকলেব মনে ভাবি আনন্দ। সবাই মিলে একটা নতুন নাটক অভিনয কববেন ঠিক হল। একটা বাবোয়াবী নাটক লেখাও হল, কিন্তু সেটাকে তেমন সুবিধেব মনে না হওয়াতে, ববীন্দ্রনাথই 'নলিনী' নাম দিযে একখানা নাটক লিখলেন। লেখা হল বটে, কিন্তু সে আব অভিনয হল না। পবিবাবে গভীব শোকের সময় এসে পড়ল।

এক মাসেব মধ্যে জ্যোতিবিন্দ্রনাথেব স্ত্রী কাদম্ববীব আব সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথেব মৃত্যু হল। আদবেব বউঠাককণকে হাবিযে কবিব সে যে কি কষ্ট হযেছিল, ভাষায বলা যায না। তাঁব উদ্দেশে 'পুষ্পাঞ্জলি' নামে গদ্য কবিতাগুচ্ছ উৎসর্গ কবেছিলেন। আব শুধু 'পুষ্পাঞ্জলি' কেন এব আগে ও পবেও অনেক বই কাদম্ববী দেবীব নামে উৎসর্গ কবেছিলেন।

যাঁদেব মধ্যে বিবাট প্রতিভা থাকে, পৃথিবীব দুঃখ শোক কিছু-দিনেব মত তাঁদেব ব্যাকুল কবে তুললেও, ব্যথা বেদনা হয়ে ওঠে তাঁদেব মনেব সম্পদ। হতাশাব মধ্য দিযে তাঁদেব প্রতিভা আবও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। এত দুঃখ পাবাব পব ববীন্দ্রনাথ যে সব প্রবন্ধ, কবিতা, গান বচনা কবলেন, সেগুলি যেন তাঁব হৃদযেব বক্ত দিয়ে বাঙা। তাবা দুঃখে ম্রিযমান হয়ে পড়ে থাকে নি, তাদেব মধ্যে আশা ও আনন্দের কথাও আছে।

'কড়ি ও কোমলেব' কবিতা এই সময়ে সৃষ্টি। 'কাঙালিনী মেয়ে' নামে কবিতাটিও তখনকাব লেখা। তা ছাড়া 'বাজপথেব কথা' 'ঘাটেব কথা' গদ্যরচনাও এই সময়ে লেখা। এগুলি পড়লেই বোঝা যায় কবিব মধ্যে আবাব একটা পবিবর্তন আসন্ন, এবাব গল্প লেখার দিকে মনটা ঝুঁকছে।

চতুর্থ অধ্যায়

বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের জীবনের ধারাটাই গেল বদলে। এতদিন ছিলেন বাড়ির ছোট ছেলে, যখন যেমন শখ হচ্ছে সেই রকম কাজ করছেন, যেখানে মন চায় বেড়াচ্ছেন। যেমনি ছিল রূপ, তেমনি গানের গলা, লেখার খ্যাতি। যেখানে দেখা দিতেন লোকে মুগ্ধ হয়ে যেত। তবে নিন্দাও শুনতে হত।

তার ছিল দুটো কারণ, প্রথম হল গুণীদের হিংসা করবার লোকের কখনো অভাব হয় না। দ্বিতীয় হল তাঁর লেখা, তাঁর কথা, তাঁর মতামতের মধ্যে এমন একটা নতুনত্ব ছিল, দুনিয়াকে দেখবার ঢঙটিই ছিল এত নতুন, যে গোঁড়া মন যাঁদের তাঁরা এই তরুণ লেখককে সইতে পারতেন না।

ব্যক্তিগত জীবনে অদল-বদল হল। বিয়ে করেছেন তার একটা দায়িত্ব তো ছিলই। তার ওপর বাবা এই সময় থেকে তাঁর ওপর জমিদারি পরিদর্শনের ভার দিলেন। ভারি দক্ষতার সঙ্গে কবি এ কাজ করতেন, সকলে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল।

নৌকো করে গ্রামের মধ্যে দিয়ে ঘুরে ঘুরে জমিদারি দেখতে হত। নিজের দেশকে চেনবার জানবার, দেশের মানুষদের বুঝবার, ভালোবাসবার এমন সুযোগ আর কোথায় পেতেন ? এর ফল দেখা গেল তাঁর আশ্চর্য প্রতিভাদীপ্ত বহু ছোট গল্পে, 'স্বদেশী সমাজ' ইত্যাদি দীর্ঘ প্রবন্ধে, তার সমস্ত চিন্তা করবার ধরনে। জোড়াসাঁকোর অট্টালিকায় বসে এসব কিছুই সম্ভব হত না।

এর উপর আরও দায়িত্ব নিতে হল, আদি-ব্রাহ্ম-সমাজের সম্পাদকতা করতে হল। রবীন্দ্রনাথের ধর্মমত ছিল ভারি উদার, ভগবানে ভক্তি ছিল সুগভীর, তাঁর অপূর্ব সব ব্রহ্ম সংগীতেই তার

যথেষ্ট প্রমাণ। কিন্তু তিনি নিজেই অনেকবার বলেছেন যে আনুষ্ঠানিক ধর্মে তাঁর তেমন আগ্রহ ছিল না কখনো। তবে মহর্ষির ছেলের যা যা কর্তব্য তার কোনোটিরই কখনো তিনি অবহেলা করেন নি। তাঁর বাবার অনুপ্রেরণায় দেশে যে একটা নতুন উদার ধর্মজীবনের সূচনা হয়েছে, এ বিষয় তিনি সর্বদা সচেতন ছিলেন। তাঁকে দিয়ে যখনই কোনো কাজ করিয়ে নেবার দরকার হয়েছে, আনন্দের সঙ্গে এগিয়ে এসেছেন।

তাঁর জীবনের ভারি একটা সৃজনশীলতার সময় এটা। ততদিনে অনেকগুলি বইও রচিত হয়ে গেছে। 'শৈশব-সংগীত,' 'আলোচনা,' 'রাজর্ষি,' 'মুকুট,' আরও নানান সুগম্ভীর কিংবা হাস্যরসে ভরা রচনা। 'সঞ্জীবনী' পত্রিকাতে তাঁর বহু প্রবন্ধ বেরিয়েছে; কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনের জন্য নতুন জাতীয় সংগীত লিখেছেন--'আমরা চলেছি মায়ের ডাকে'।

কয়েক বছরের মধ্যে অনেকগুলি নাটকও লেখা হয়ে গেল। সখী সমিতি বলে তাঁর দিদি স্বর্ণকুমারী দেবীদের এক মহিলা-সমিতি ছিল, তাদের জন্য 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্য; তারপর 'রাজা ও রাণী'; 'বিসর্জন'। সেগুলি অভিনয়ও হল, ওঁরা নিজেরাই ভূমিকা নিলেন।

বিয়ের পর সাত আট বছর কেটে গেছে, তখন তাঁর তিনটি ছেলে-মেয়েকে তাদের মায়ের কাছে রেখে, আরেকবার বিলেত ঘুরে এলেন। ফিরে এসে জমিদারির কাজে একেবারে ডুবে যেতে হল। ছড়ানো জমিদারি, পতিসর, শিলাইদা, কুষ্টিয়া, পাবনা, কুমারখালি, কটক —সব জায়গায় যেতেন, ভারি একটা সুশৃঙ্খলার সঙ্গে কাজ চালাতেন।

এই ঘুরে বেড়ানোর মধ্যে মধ্যে সাহিত্য রচনা চলত। অনেকগুলি ছোট গল্প লেখা হল, তার মধ্যে 'পোস্ট মাস্টার' গল্প উল্লেখযোগ্য;

'চিত্রাঙ্গদা' লিখলেন, মহাভারত থেকে অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদার গল্প নিয়ে কাব্য-নাট্য। 'গোড়ায় গলদ' নামে সরস এক নাটক লিখলেন, তা ছাড়া 'সোনার তরী'র অনেক কবিতা রচনা করলেন।

কবির হৃদয়ের সেই কোমল লতিকাটিকে এখন আর চেনা যায় না, সে যেন একটা বলিষ্ঠ গাছে পরিণত হয়ে গেছে। দেশের সমস্ত চিন্তাধারার সঙ্গে তাঁর পবিচয় হয়েছে। বহু পত্রিকাতে নানান বিতর্কে তাঁর নাম দেখা যাচ্ছে; হিন্দুবিবাহ, স্ত্রী-মজুর, চাকরির উমেদাবি, সব কিছু নিয়ে প্রবন্ধ বেরিয়েছে। শিক্ষা বিষয়ক বচনাও অনেক লিখেছেন। 'সাধনা' নামে নতুন পাত্রকা বেব করেছেন ভাইপো সুধীন্দ্রনাথ, তাতে বিখ্যাত 'শিক্ষার হের-ফের' ছাপা হয়েছে। এই প্রবন্ধে কবি বাংলা ভাষাব মাধ্যমে শিক্ষাদানেব কথা বলেছেন। 'পঞ্চভূতের ডায়েরি' নাম দিয়ে বিবিধ বিষয়ে আলোচনার বই লিখেছেন, 'কাবুলীওয়ালা' গল্প লিখেছেন; কচ ও দেবযানীর গল্প নিয়ে 'বিদায় অভিশাপ' কবিতা লিখেছেন। আবার মধ্যে মধ্যে শখ কবে ছবি আঁকাও অভ্যাস কবেছেন।

এত কথার মধ্যে একটা কথা বাদ পড়ে গেছে, সেটা হল রবীন্দ্রনাথ এতদিনেব মধ্যে ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য কি লিখে-ছিলেন? সকলেই জানেন যে যাঁরা তাঁদের নিজেদের ছোটবেলার কথা মনে রাখতে পারেন, শুধু তাঁবাই ছোটদেব জন্য লিখতে পারেন। ছোটবেলার কথা ভালো কবে মনে বাখতে হলে, শুধু ঘটনাগুলো মনে করলে চলবে না, সেই সঙ্গে তখনকার মনেব ভাবগুলোকেও স্মরণ রাখতে হবে।

যাঁরা ববীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' কিংবা 'ছেলেবেলা' পড়েছেন, তাঁরা একথাও জানেন যে ছোটবেলাকার কত বাশি রাশি কথাই না তাঁর মনের মধ্যে জমা ছিল। কুড়ি বছর বয়সে ছোটদের জন্য প্রথম কবিতা লেখেন 'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান'—

রাজ্যের ছোট ছেলের মনের কথা দিয়ে এই কবিতার পদগুলি একেবারে ঠাসা রয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের বিবাহের বছর দুই পরে তাঁর মেজবউঠাকরুণ, সত্যেন্দ্রনাথের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সম্পাদনায় 'বালক' নাম দিয়ে ঠাকুরবাড়ি থেকে একখানি ছোটদের পত্রিকা বেরোয়। গোড়ায় তাঁদের ইচ্ছা ছিল বাড়ির ছেলেমেয়েদের লেখা দিয়েই কাগজটি চলবে। কিন্তু সে যে হবার নয়, একথা বুঝতে পেরে শেষটা রবীন্দ্রনাথের উপর কাগজ পরিচালনার ভার দেওয়া হয়েছিল। এবার তাঁর হাতের একটা নতুন দিক খুলে গেল। ছোটদের জন্য কত যে গল্প, প্রবন্ধ, নাটিকা, কবিতা লিখলেন, তার ঠিক নেই।

ছোটদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একটা ভারি উঁচু ধারণা ছিল। তিনি বলতেন, ভালো করে বুঝিয়ে দিলে ছোটরা অনেক শক্ত শক্ত তত্ত্বও বুঝতে পারে। কোনোরকমের খোকামি তাঁর অসহ্য ছিল। আধো আধো ভাষায়, কবিতা লেখা তিনি দেখতে পারতেন না, তাঁর বিশ্বাস ছিল তাতে ছোটদের বুদ্ধিকে অসম্মান করা হয়।

অনেককাল পরে 'ভানুসিংহের পত্রাবলী' বলে তাঁর একটা বই প্রকাশিত হয়েছিল, তার মধ্যে ছিল ছোট একটি মেয়েকে লেখা তাঁর অনেকগুলি চিঠি। সে-রকম রসে ভরা চিঠি কেউ কাউকে লিখতে পারে না, আবার তার মধ্যে সহজ ভাষায় কতই না গম্ভীর গূঢ় কথাও আছে। সেই ছোট মেয়েটি কত আনন্দের সঙ্গে এই চিঠিগুলি পড়ত।

'বালক' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর বহু কবিতা—'হাসিরাশি,' 'পুরোনো বট,' 'মা-লক্ষ্মী,' 'আকুল-আহ্বান,' আরো কত,—সবগুলিই বুদ্ধিদীপ্ত ও ভাবে ভরপুর, কিন্তু প্রত্যেকটিই ছোটদের উপযুক্ত।

'রাজর্ষি' গল্প, 'মুকুট' নাটকের কথা তো বলাই হয়েছে। ওগুলিও 'বালকে' বেরিয়েছিল। তারপর মাঝে মাঝে এদিকে ওদিকে বেড়াতে

যেতেন। সেই রকম একবার গিরিডি থেকে মানুষ-ঠেলা পুশ-পুশ গাড়ি চেপে হাজারিবাগ গিয়েছিলেন, তার সরস বর্ণনাও 'বালকে' ছেপেছিলেন।

ছোটদের জন্যই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান চিন্তা। স্কুলে পড়তে গিয়ে নিজে বড় কষ্ট পেয়েছিলেন, তাই মনের পিছনে সর্বদা এই ভাবনা থাকত, আনন্দের মধ্যে দিয়ে প্রকৃতির বুকের মাঝখানে কেমন করে ছেলেমেয়েদের মানুষ করা যায়। দিনে দিনে শহরে বাস করা তাঁর পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠছিল। জমিদারির কাজে তাঁকে প্রায়ই গ্রামাঞ্চলে ঘুরতে হয়, কিন্তু স্ত্রী ছেলেমেয়েরা তো থাকে শহরের সেই কৃত্রিম আবহাওয়ার মধ্যে, তাই বড় ভাবনা।

১৮৯৪ সালে তাঁর আরেকটি ছেলে হল, তাঁর নাম রাখলেন শমীন্দ্র। এখন তাঁর পাঁচটি ছেলেমেয়ে, বড় মাধুরীলতা, তারপর রথীন্দ্রনাথ, তারপর রেণুকা, তারপর মীরা, সবচেয়ে ছোট শমীন্দ্রনাথ। এদের মনের মত করে মানুষ করাটাই হয়ে উঠল একটা দুশ্চিন্তা। জোড়াসাঁকোর পুরনো নিয়মে যে এদের বড় হয়ে উঠতে দেবেন না, এটা কবি মনে মনে স্থির করে রেখেছিলেন। পরে কিছুদিন সবাইকে শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে নিয়ে গিয়ে রাখলেন।

মাঝে মাঝে তখন সমস্ত জীবনধারার বিরুদ্ধেই মনের মধ্যে একটা ক্ষোভ জমা হত। তাঁর মত যার চরিত্রে সর্বদা একটা প্রচণ্ড পৌরুষ বিরাজ করত, তার পক্ষে পদে পদে ইংরেজ শাসকদের স্পর্ধা ও অবিচার সহ্য করা কঠিন। যখনই এই রকম কোনো ঘটনা তাঁর নজরে পড়ত, তখনই তার প্রবল প্রতিবাদ করতেন। তার ছোট গল্প 'মেঘ ও রৌদ্র' তাঁর বিখ্যাত সব প্রবন্ধ 'ইংরেজ ও ভারতবাসী', 'ইংরেজ আতঙ্ক', 'সুবিচারের অধিকার', 'অপমানের প্রতিকার', আরও কত রচনা এই পৌরুষেরই সাক্ষ্য দিয়েছে।

আসলে রাজনীতি তাঁর ভালো লাগত না, দলাদলিকে চিরকাল ঘৃণা করতেন; কিন্তু নিজের মনুষ্যত্বে যেখানে আঘাত লাগত, সেখানে চুপ করে থাকা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। কবিদের আত্মসম্মান হয় পাহাড়ের মত বিশাল। তাকে রক্ষা করতে না পারলে তাঁদের কাব্যসৃষ্টিই বৃথা হয়ে পড়ে। কাব্যের অন্তরে যদি একটা মহান সত্য না থাকে, সে কাব্যের কোনো মূল্য থাকে না। অসত্যের, অন্যায়ের কাছে মাথা নোয়ালে, সেই সত্য আর হৃদয়ের মধ্যে বাঁচতে পারে না। তাকে বিদায় নিতে হয়। তাই প্রকৃত যারা কবি, তাঁদের চরিত্রে আশ্চর্য বল ও সাহস থাকে। রবীন্দ্রনাথের যেমন ছিল। কিন্তু ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা তাঁর আসল কাজ ছিল না, তাঁর কাজ হল কাব্য রচনা। সে কাজেরও কখনো তিনি অবহেলা করেন নি।

যে সময়ের কথা হচ্ছে, তার অত ক্ষোভ অভিমানের মধ্যেও 'ক্ষুধিত-পাষাণ' নামে বিখ্যাত গল্প লিখেছিলেন। এই গল্পের কথা প্রথম তাঁর মনে হয়, প্রথমবার বিলেত যাবার আগে, আমেদাবাদে থাকার সময়। 'জীবন দেবতা' কবিতা লেখেন, 'চৈতালী'র কবিতাগুলো লেখেন, 'কল্পনা'র কবিতা লেখেন, 'বৈকুণ্ঠের খাতা' বলে একটা হাসির নাটক লেখেন। তা ছাড়া 'গান্ধারীর আবেদন' 'সতী' 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' ইত্যাদি কাব্য-নাট্য লেখেন।

সেই যে অনেকদিন আগে সদর স্ট্রীটের বাড়িতে থাকার সময় মনের মধ্যে থেকে যেন একটা বাধা সরে গিয়েছিল, সেই থেকে ভরা-নদীর জলের মত যে সব রচনা তাঁর কলম থেকে বেরোতে লাগল, তার প্রবলতা ও মাধুর্য দেখে লোকে স্তম্ভিত হয়ে গেল। তবু এখনো তাঁর জীবনের আসল কাজের সময় আসে নি। ছোটদের কথা কোনোদিনও ভোলেন নি। দারুণ ব্যস্ততার মধ্যেও 'ছেলে ভুলানো ছড়া' বের করলেন, তার মধ্যে বাংলা দেশে যত ছোটদের ছড়া

পেলেন, সব এনে জড়ো করেছিলেন। তিনি বলতেন, এইসব ছড়ার মধ্যে চষা ক্ষেতের ভিজে মাটির গন্ধ, ছোট ছেলের গায়ের মিষ্টি গন্ধ লেগে থাকে।

আশ্চর্য সব রচনা এই সময়কার। 'কথা ও কাহিনী'র কবিতায় লেখা গল্পগুলি ভোলা যায় না। তাদের মধ্যে যে উদারতা আর মনুষ্যত্বের ইঙ্গিত আছে, সে তো দেশের যত ছেলেমেয়ে, তাদেরই জন্য। 'ক্ষণিকা'র কবিতাও এই সময় লেখা হল। তারপর কবির ভাগ্নী সরলাদেবী ধরে বসলেন 'ভারতী' পত্রিকার জন্য মজাদার নাটক লিখে দিতে হবে। লিখলেন 'চিরকুমার সভা', কেউ বিয়ে করবে না প্রতিজ্ঞা করে, কেমন সব বিয়ে করে ফেলল তারই হাসির কাহিনী।

যখন লেখাতে পেয়ে বসত, রবীন্দ্রনাথ অন্য মানুষ হয়ে যেতেন। তখন হঠাৎ কাছে গিয়ে বিরক্ত করাব সাহস কারো হত না। শোনা যায় খাবার সময় হলে অনেক সময় কাজ রেখে উঠে এসে খাওয়া সেরে নিয়ে, আবার ঠিক যে জায়গা থেকে লেখা ছেড়ে এসেছিলেন, সেইখান থেকে ধবতেন, যেন এর মধ্যে কোনো ব্যাঘাত ঘটে নি।

জীবনটা আসলে গড়িয়ে গড়িয়ে ওই শান্তিনিকেতনের দিকেই চলেছিল। শিলাইদহে একটা ছোটখাটো পরীক্ষাব মতন হয়ে গেল, কয়েকজন মাস্টারমশাইকে আব নিজের ছেলেমেয়েদের দিয়ে। সেখানকার জীবনযাত্রাই অন্যবকম। সব কিছু ছেড়েছুড়ে, ইচ্ছা হলেই, পদ্মাব চরে বাঁধা নৌকোয় শুয়ে, নীল আকাশের দিকে চেয়ে থাকা যায়। কোথাও জনমানষেব সাড়া নেই শুধু অনেক উঁচুতে নীল আকাশে কালো চিল উড়ছে দেখা যায় আর কানের বড় কাছে নদীর জলের কলকল ছলছল শব্দ শোনা যায়। এই দেখে, এই শুনে কবির নিজের কত সময় কেটেছে। এখন ছেলে মেয়েদেবও এই পরিবেশের মধ্যে এনে ফেললেন।

মাস্টারমশাইদের মধ্যে লবেন্স নামে এক সাহেবও ছিল, সে

ইংরেজি পড়াত, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান শেখাত আর রেশমের পোকা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করত। রেশমের পোকা দিয়ে তার ঘর বোঝাই থাকত, মাঝে মাঝে নিজের খালি গায়ের উপর পোকাগুলোকে ছেড়ে দিয়ে চুপ করে শুয়ে থাকত আর গাময় শুঁয়োপোকার মত পোকাগুলো হেঁটে বেড়াত। সে এক দেখবার জিনিস ছিল। শোনা যায়, কবির বন্ধু অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় নাকি গোড়ায় কুড়িটি রেশমের কীট ওঁদের বাড়িতে রেখে গিয়েছিলেন, দেখতে দেখতে তারা ডিম পেড়ে ছানা তুলে লক্ষ লক্ষ পোকার ব্যবস্থা করে ফেলল। তাদের খাবার জোগানোই এক ব্যাপার হয়ে উঠল। আর কি খিদে রে বাবা! দিনরাত শুধু খাই-খাই, আবার তুঁত গাছের পাতা ছাড়া কিছু মুখে দেয় না!

চাষবাসের নানারকম পরীক্ষাও কবি চালিয়েছিলেন, আমেরিকার ভুট্টার, মাদ্রাজের সরু ধানের চাষের পরীক্ষা করা হয়েছিল।

শিলাইদহে জগদানন্দ রায় কবির ছেলেমেয়েদের শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হলেন। পরে শান্তিনিকেতনের ছেলেরাও এঁর কাছ থেকে কত শাসন, আর কত আদর পেয়েছিল।

আগেই বলা হয়েছে কোনো একরকম ভাব নিয়ে কবি বেশিদিন পড়ে থাকতে পারতেন না। থাকেন শিলাইদহে, কিন্তু নানান কাজে প্রায়ই কলকাতায় আসতে হয়। কলকাতায় এলেই সাংসারিক কর্তব্য তাঁকে যেন গিলে খেতে চায়, আবার শিলাইদহে ফিরে গিয়ে তবে হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন।

সুখ দুঃখের মধ্যে দিয়ে দিনগুলি কাটে। বড় আদরের ভাইপো বলেন্দ্রনাথের মৃত্যু হল। বলেন্দ্র ও সুরেন্দ্রের আখমাড়াই ইত্যাদি কতকগুলি ব্যবসা ছিল, এখন তাদের ভারি দুর্গতি। এক সময় রবীন্দ্রনাথই তাদের এই কাজে উৎসাহ দিয়েছিলেন। এখন তাদের সমস্ত ঋণভার নিজের উপর নিয়ে ব্যবসা গুটিয়ে ফেললেন। সেই ঋণ শোধ করতেও কবিকে কম কষ্ট পেতে হয় নি।

তবে এসব হাঙ্গামায় তাঁর কাব্যপ্রতিভার কোনো ক্ষতি হত না। লোহাকে যেমন পিটলে সে আরো শক্ত হয়ে ওঠে, তেমনি সংসারের আঘাত-প্রতিঘাতে কবির চরিত্রে আরও দৃঢ়তা দেখা যেতে লাগল।

জীবনে অনেকগুলি গুণী লোকের সঙ্গ পেয়েছিলেন কবি—বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর মহাশয়, বিহারীলাল চক্রবর্তী, অক্ষয় চৌধুরী, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, বিপিনচন্দ্র পাল, জগদীশচন্দ্র বসু, লোকেন পালিত, আশুতোষ চৌধুরী--কত নাম করা যায়? তাঁদের সান্নিধ্য পাওয়াটাও কম ভাগ্যের কথা নয়।

দেশকে জেনেছেন, দেশের লোকদের শ্রদ্ধা করতে পেরেছেন, নিজেও তাদের শ্রদ্ধা পেয়েছেন, তার ফলে তাঁর গভীর দেশানুরাগ নানান ভাবে প্রকাশ পেতে লাগল। তখনকার দিনের অভিজাত সমাজে বড় বেশি ইংরেজ-প্রীতি ছিল, পোষাকপরিচ্ছদে, আদব-কায়দায় সবাই ইংরেজদের অনুকরণ করতেন। রবীন্দ্রনাথ ধুতি পাঞ্জাবি পরে, চাদর গায়ে দিয়ে, চটি পায়ে দিয়ে, সব জায়গায় যাওয়া আসা ধরলেন। সভাসমিতিতে ইংরেজিতে বক্তৃতা দেওয়ার রেওয়াজ ছিল তখন, রবীন্দ্রনাথ তা সহ্য করেন কি করে? ১৮৯৭ সালে নাটোরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন হল, রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর বন্ধুরা সেখানে গিয়ে দাবী করলেন, এমন একটি স্বদেশী অনুষ্ঠান, এর সভার ভাষা হোক স্বদেশী! বেজায় সাহেব যাঁরা, ইংরেজি ছাড়া কথা কন না, তাঁরাও নাকি সেখানে মধুর বাংলায় বক্তৃতা করেছিলেন। কবির চরিত্রের এমনি গুণ!

পঞ্চম অধ্যায়

এতদিনে প্রায় চল্লিশ বছর বয়স হয়েছে রবীন্দ্রনাথের, এখনো মন বসাবার মত একটা কর্মক্ষেত্র খুঁজে পেলেন না। সময় কিন্তু কেটে যাচ্ছে। কিছুদিন এ পত্রিকা সম্পাদনা করেন, আবার ছেড়ে দিয়ে ও পত্রিকা নিয়ে পড়েন। 'হিতবাদী' আর 'সাধনা'র যুগ গেল, এবার 'বঙ্গদর্শন' নতুন করে প্রকাশিত হতে শুরু করল, তার সম্পাদনার ভার পড়ল তাঁর উপর। পৃথিবীরও তখন নানান জায়গায় অশান্তি, দক্ষিণ আফ্রিকাতে 'বোয়ার' যুদ্ধ চলেছে ইংরেজ ও ডাচ ঔপনিবেশিকদের মধ্যে ; সেখানে ইংরেজদের ঔদ্ধত্যের সমালোচনাও করছেন, আবার 'নৈবেদ্যে'র কবিতাগুলিও লিখছেন। এসব কবিতায় প্রাচীন হিন্দুদের আদর্শগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, সে কবিতা শুনে বৃদ্ধ মহর্ষি কত খুশি হয়েছিলেন। এ ছাড়া 'চোখের বালি' বলে নতুন ধরনের উপন্যাস লেখা হয়েছে, তাতে ঘটনার চেয়ে চরিত্রদের মনস্তত্ত্ব নিয়েই বেশী কথা আছে।

সাংসারিক কাজও চলেছে, বড় দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। বড় জামাই ছিলেন কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর ছেলে, মেজ জামাই ডাক্তার। সবই হল, অথচ যে কাজের ওপর মনে মনে এত আশা, সে শুরু হল না। ভেবে ভেবে কবির মনে হল, যে পরিবেশের মধ্যে ছোট ছেলেমেয়েদের মানুষ করা উচিত, শান্তিনিকেতনেই তাকে পাওয়া যাবে। ওখানকার নীল আকাশের পবিত্র আচ্ছাদন ছোটদের মনে যে পবিত্রতা ও আনন্দ এনে দিতে পারবে, আর কোথাও তেমনটি সম্ভব হবে না। মহর্ষির সঙ্গে এই নিয়ে পরামর্শ চলল ; তাঁর সম্পূর্ণ সমর্থন ছিল, কিন্তু এ কথাও রবীন্দ্রনাথকে স্পষ্ট করে বুঝে নিতে হল যে নতুন বিদ্যালয়ের যাবতীয় দায়িত্ব তাঁকে

ব্যক্তিগতভাবে নিতে হবে, পারিবারিক সম্পত্তি থেকে ওখানকার খরচ চালাবার ব্যবস্থা হবে না। রবীন্দ্রনাথ এতে সম্পূর্ণ রাজী ছিলেন।

এই রাজী হওয়াটা কম সাহসের কথা নয়। তখনকার দিনে বই লিখে আর কারো ঘরে খুব বড় একটা টাকার অঙ্ক আসত না। সামান্য যা আসত, তার ওপর শোনা যায় মাত্র আড়াইশো টাকা ওঁর মাসহারা ছিল। তাছাড়া ছিল পুরীতে বাড়ি, আর মৃণালিনী দেবীর গহনাগুলি। এ সবই বিক্রি করে ফেলা হল। তারপর ঝাড়া হাত পা হয়ে সপরিবারে শান্তিনিকেতনে গিযে বসলেন। মনে কোনো খেদ থাকল না ; এই তো তিনি চেয়েছিলেন ; আর মৃণালিনী দেবীও তাঁর উপযুক্ত সহধর্মিনীর কাজ কবেছিলেন।

এখনকার শান্তিনিকেতন দেখে তখনকার দিনের আশ্রমের সম্বন্ধে কোনো ধারণাই হয় না। সে সময়কার আশ্রম ছেলে পড়াবার জন্য তৈরি হয় নি, সে ছিল একটি সাধনার স্থান—ব্রহ্মমন্দিরটি, তার পিছনে দোতলা বাড়িখানি, কুয়ো, আমবাগান, কয়েকটা গাছপালা, আর মাটির ঘর। আর এগুলিকে ঘিরে ছিল খোলা মাঠ, সেখানে দৃষ্টি কোথাও বাধা পেত না।

বোলপুরও তখন এত বড় শহব হয়ে ওঠে নি, ধানকল তখনও বসে নি, পথঘাট নিরালা ছিল। আশ্রমের ওই দোতলা বাড়িটি ছাড়া আর একটিমাত্র পাকা বাড়ি ছিল, সেখানে পুবনো কতকগুলি পত্রিকা ও বইয়ের সংগ্রহ ছিল। আশ্রমের একজন রক্ষী ছিল, তার নাম দ্বারী সর্দার, সে নাকি আগে ডাকাত ছিল। দ্বারীর ছেলে হরিশ মালীর কাজ করত। দোতলা বাড়ির একতলায় কবির ভাইপো দ্বিপেন্দ্রনাথ থাকতেন, উপরতলায় তিনি সস্ত্রীক আশ্রয় নিয়েছিলেন।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় বলে একজন শিক্ষকেব সহযোগিতায় কযেকটি মাত্র ছেলে নিয়ে স্কুল তো শুরু হয়ে গেল। দেখতে দেখতে তাব গল্প চাবিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। জামতলায় ক্লাশ নেন কবি,

ছেলেদের মাইনে টাইনে দিতে হয় না—পরে অবিশ্যি সামান্য কিছু দিত তারা, নইলে বিদ্যালয়ের খরচ চালানো দায় হয়ে উঠেছিল।

ব্রহ্মবান্ধবের সঙ্গে ছিলেন তাঁর শিষ্য রেবাচাঁদ। সন্ন্যাসী মানুষ তাঁরা, পয়সাকড়ির ধার ধারতেন না। আরো দুজন তরুণ বয়সের গুণী লোকও এসে জুটলেন, অজিতকুমার চক্রবর্তী ও কবি সতীশচন্দ্র রায়। পার্থিব লাভের আশা ছেড়ে দিয়ে এঁরা এলেন। এমনি করে নতুন বিদ্যালয়ের পত্তন হল।

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হল অনেকটা সেকালের তপোবনের আশ্রমের আদর্শ নিয়ে। প্রকৃতির বুকে সাদাসিধা অনাড়ম্বর জীবন, গুরু শিষ্যের মধ্যে ভারি একটা স্নেহের সম্বন্ধ, শুধু লেখাপড়ার বিষয় নয়, কাজকর্মে প্রতিদিনকার সাধারণ জীবনে। তবে যে নিয়মগুলি একালে অচল, সে সব আর নতুন বিদ্যালয়ে চালাবার চেষ্টা হল না।

দেখতে দেখতে আরো নতুন কর্মীরা এসে দাঁড়ালেন, জগদানন্দ রায়, তিনি শেখাতেন অঙ্ক ও বিজ্ঞান। মোহিতচন্দ্র সেন এসে কিছুদিন কাজ করে গেলেন। ক্রমে ক্রমে এলেন নন্দলাল বসু, ক্ষিতিমোহন সেন, বিধুশেখর শাস্ত্রী, আরো কতজনা।

এ বিদ্যালয় স্থাপন হয়েছিল অন্যান্য সাধারণ স্কুলের বিপক্ষে যেন একটা প্রতিবাদের মত। এখানে ছিল অবাধ স্বাধীনতা, যার মধ্যে প্রত্যেকটি ছোট ছেলের মনের পাপড়িগুলো একে একে ফুটে ওঠবার অবকাশ পায়। বাঁধাধরা নিয়ম কানুন ছিল না, কিন্তু সকলেই আশ্রমের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠত। সেবা ও স্বার্থত্যাগ আর কষ্টস্বীকার তাদের জীবনের একটি স্বাভাবিক অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

একটু অন্য রকমের হলে যা হয়, খুঁত ধরবার লোক জুটল মেলা। কেউ বলে ওখানে বনবাদাড়ের মধ্যে আবার পড়াশুনো হয় নাকি! যেমনি গুরু তেমনি সব চেলা, লম্বা চুল রেখে খালি পায়ে শুধু কবিতা লেখে আর ন্যাকামি করে। কেউ বা বললে ঠিক তার উল্টো, যত সব

অঘামারা বোম্বেটে ছেলের দল ওখানে জুটেছে, পড়াশুনা তো হয় ছাই, শুধু ডানপিটেমি করে ওদের দিন কাটে!

শুধু বাইরের লোক কেন, আত্মীয়স্বজনদের মধ্যেও শান্তি-নিকেতনের বিদ্যালয় সম্বন্ধে উৎসাহের অভাব দেখা গিয়েছিল, কিন্তু কোনো কিছুতেই কবিকে দমিয়ে দিতে পারে নি।

খালি পায়ে থাকে সবাই, আলখাল্লা পরে, ভোরে উঠে ঠাণ্ডা কনকনে জলে স্নান করে, নিরামিষ খায়, রাঁধাবাড়া ছাড়া আর সব কাজই প্রায় নিজেরা করে নেয়। বড়রা ছোটদের দেখাশুনা করে, অতিথি কেউ এলে সবাই মিলে তার পরিচর্যায় লেগে যায়। রবীন্দ্রনাথকে সকলে গুরুদেব বলে ডাকে। আর সে যে কি একটা গানের, গল্পের, আনন্দের হাওয়া বয় দিনরাত!

ভোরে ওঠা, সকাল সকাল শোওয়া, চাঁদনি রাতে গান গেয়ে জেগে থাকা, প্রকৃতির সঙ্গে ছয় ঋতুকে ডেকে নেওয়া, সব চাইতে আদিম যে জিনিসগুলো—জল, মাটি, হাওয়া, আলো, আকাশ—সেগুলোকে বুক ভরে ভালোবাসা, মানুষ হয়ে উঠতে আর খুব বেশি কিসেরই বা দরকার লাগে?

রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয়ের খ্যাতি চারদিকে ছড়াতে লাগল, ছাত্রদের সংখ্যাও বাড়তে লাগল; কাজের পরিমাণ, টাকার সমস্যাও সেই সঙ্গে বাড়তে লাগল। অথচ তাঁর মুখ দেখে সে কথা কারো বুঝবার উপায় ছিল না।

পড়াশুনার একটা কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম বেঁধে না দিয়ে, প্রথম দিকে নানারকম পদ্ধতিতে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছিল। বহুকাল পরে 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' বলে একটা ছোট পুস্তিকাতে কবি লিখেছিলেন :—

"দীর্ঘকাল ধরে শিক্ষা সম্বন্ধে আমার মনের মধ্যে যে মতটি সক্রিয় ছিল, মোটের উপর সেটি হচ্ছে এই যে, শিক্ষা হবে প্রতিদিনের

জীবনযাত্রার নিকট অঙ্গ, চলবে তার সঙ্গে এক তালে, এক সুরে, সেটা ক্লাসনামধারী খাঁচার জিনিস হবে না। আর যে বিশ্বপ্রকৃতি প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে আমাদের দেহে মনে শিক্ষা-বিস্তার করে, সেও এর সঙ্গে হবে মিলিত। প্রকৃতির এই শিক্ষালয়ের একটা অঙ্গ পর্যবেক্ষণ আর একটি পরীক্ষা, এবং সকলের চেয়ে বড় তার কাজ প্রাণের মধ্যে আনন্দ-সঞ্চার। এই গেল বাহ্য প্রকৃতি। আর আছে দেশের অন্তঃপ্রকৃতি, তারও বিশেষ রস আছে, রঙ আছে, ধ্বনি আছে। ভারতবর্ষের চিরকালের যে চিত্ত সেটার আশ্রয় সংস্কৃত ভাষায়। এই ভাষার তীর্থপথ দিয়ে আমরা দেশের চিন্ময় প্রকৃতির স্পর্শ পাব, তাকে অন্তরে গ্রহণ করব, শিক্ষার এই লক্ষ্য মনে আমার দৃঢ় ছিল।"

যা মনের মধ্যে থাকে, বাইরের পৃথিবীতে সব সময় তাকে রূপ দেওয়া যায় না। অনেক সময়ই কিছুটা অদল বদল করে নিতে হয়। এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল, তবে আদর্শটি ছিল ওই রকম।

গোড়া থেকেই কবি ইংরেজি পড়ানো হবে বলে স্থির করেছিলেন, নইলে নানান জ্ঞাতব্য বিষয় জানা যাবে না। তবে বাংলা ভাষাকেই প্রধান আসন দেওয়া হল। শরীর চর্চা, আশ্রমের পরিচর্যা, গাছপালার যত্ন, এও ছিল শিক্ষার অঙ্গ। আশ্রমের তখন নাম ছিল বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রম।

আস্তে আস্তে বিদ্যালয়টি লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে লাগল, অনেক ছেলে আসতে লাগল, তাদের মধ্যে অনেকে তাদের পরবর্তী জীবনে দেশের লোকের সম্মান অর্জন করতে পেরেছিলেন। তাঁরা প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যে গুরুদেবের ওই শিক্ষার আদর্শটি নিষ্ফল নয়।

জীবনের সব দিনগুলি কারো সুখে কাটে না, রবীন্দ্রনাথের জীবনেও আবার দুঃখের দিন এল। আশ্রম গড়ার সময় মৃণালিনী

দেবী নিজের গয়না দিয়েছিলেন, তারপর আশ্রমের গৃহস্থালীর সম্পূর্ণ ভার নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন, তাঁর স্নেহের স্পর্শে আশ্রমটি হয়ে উঠেছিল বড় একটি পরিবারের মত, যেখানে মায়া-মমতার স্নেহছায়াতে দুঃখের সময় প্রাণ জুড়োয়। সেই মৃণালিনী দেবীর কঠিন অসুখ হল, কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে ১৯০২ সালে তাঁর মৃত্যু হল। কবিকে পাঁচটি সন্তানের একাধারে বাবা মা দুই-ই হতে হল। স্ত্রীকে মনে করে "স্মরণ" বলে কবিতা গুচ্ছ রচনা করেছিলেন।

আরো শোক ছিল তাঁর কপালে, মেজমেয়ে রেণুকা অসুখে পড়ল, তাকে নিয়ে কবি আলমোড়া গেলেন, সেখানে 'শিশু' বইটির কবিতাগুলি লিখলেন, ওগুলি পড়ে মাতৃহারা ছোট ছেলে শমীন্দ্র বড় আনন্দ পেত। কিন্তু রেণুকাকে বাঁচানো গেল না, মায়ের মৃত্যুর ছয় মাস পরে তারও মৃত্যু হল।

দুঃখে বুক ভেঙে গেলেও, প্রতিভা কখনও অলস থাকে না। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকাতে কবি ধারাবাহিকভাবে 'নৌকাডুবি' নামে একটা উপন্যাস লিখে যেতে লাগলেন। তা ছাড়া অনেকগুলি রাজনৈতিক প্রবন্ধও রচনা করলেন।

পরের বছর কবির তরুণ বন্ধু ও সহকর্মী সতীশচন্দ্র রায় বসন্ত হয়ে মারা গেলেন। কবি সমানে লিখে যেতে লাগলেন, যেন ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ বড় তুচ্ছ জিনিস। চিরদিন স্বদেশকে প্রবলভাবে, প্রচণ্ড-ভাবে ভালোবেসে এসেছেন। সেই ভালোবাসা কত অপূর্ব গানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। সেই নবীন বয়সে যখন লিখেছিলেন—'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে', তখন থেকেই। কিন্তু দেশের জন্য শুধু কবিতা গান লেখা ছাডাও আরো বাস্তব কাজ করবার বাসনা তাঁর মনের মধ্যে ছিল। ১৯০৪ সালে তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ 'স্বদেশী সমাজ' লিখে, একটা বিশেষ সভায় সেটিকে পাঠ করেন। এই প্রবন্ধে কবি দেশসেবা কাকে বলে তার একটা সুন্দর চিত্র দিয়েছেন, বিলেতের

দেশসেবার সঙ্গে ভারতীয় দেশসেবার আদর্শের তফাৎ কোথায় দেখিয়ে দিয়েছেন। তারা দেশের সব বিষয় উন্নতির জন্য সরকারের দিকে চেয়ে থাকে, আমাদের দেশের আদর্শ হল নিজেদের অভাব নিজেদের মেটানো।

কতকগুলো এমন যুক্তিযুক্ত কথা আছে এই প্রবন্ধে, যা একজন কবির কাছ থেকে সাধারণতঃ আশা করা যায় না। সেই পরামর্শগুলো এতকাল পরে, ভারত স্বাধীন হবার এতদিন পরে, আস্তে আস্তে কাজে লাগানো হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, বাইরের আড়ম্বরের জন্য দেশের টাকা খরচ করা অন্যায়। দেশের দৈন্য ঘোচাতে হলে কুটির-শিল্পগুলিকে সাহায্য করতে হবে। গ্রামগুলির অযত্ন করলে চলবে না, গ্রাম ছেড়ে সব শহরে গিয়েও ভিড় করলে চলবে না। সেকালে সারা শীতকাল গ্রামে গ্রামে মেলা হত, সেখানে নানান জায়গার হাতের কাজ তো বিক্রী হতই, তা ছাড়া কবি-লড়াই, যাত্রা-গান, লোকসংগীত ইত্যাদি দিয়ে একটা প্রাণের সাড়া জাগানো হত। এখন সেই সবের পুনরুদ্ধারের সময় এসেছে। সাতান্ন বছর আগে কবি যে কথা বলেছিলেন, এখনো আমরা আমাদের নেতাদের মুখে সেই কথাই শুনছি। কবিদের দৃষ্টি এমনই সুদূরগামী হয়।

দেশের জন্য প্রাণে কেমন একটা আকুলতা জেগেছিল নিশ্চয়ই। 'শিবাজী-উৎসব' বলে যে কবিতা রচনা করেছিলেন, সেও গভীর দেশ-প্রেমের প্রেরণাতেই।

দেখতে দেখতে আরো এক বছর কেটে গেল, ১৯০৫ সালের জানুয়ারী মাসে পিতৃদেবের মৃত্যু হল। দেশের মাথার ওপর থেকে যেন একটা বিশাল বটগাছ পড়ে গেল, যার ছায়াতে বাঙালী সমাজ দীর্ঘকাল নিরাপদে বাস করছিল।

কবির বিদ্যালয়ের এখন বড়ই অর্থাভাব, সর্বদা টাকার চিন্তা করতে হয়। মাত্র দুহাজার টাকা দিয়ে 'হিতবাদী' পত্রিকার মালিকদের

কাছে তিনটি উপন্যাস, সমস্ত ছোট গল্পগুলি, ছয়টি নাটক, সমস্ত গান ও অনেকগুলি প্রবন্ধের স্বত্বাধিকার বিক্রি করে দিতে তিনি বাধ্য হলেন। এসব ত্যাগ কিন্তু তাঁর কাছে অতি তুচ্ছ ব্যাপার, মাথায় ঘুরছে সব সময় দেশসেবার কথা। শুধু মুখের কথা নয়, সত্যিকার কাজের কথা।

শিক্ষা নিয়ে তখন বড় মতভেদ চলছে, সরকারের পক্ষ থেকে বাংলা পাঠ্যপুস্তকগুলোকে চারটি আঞ্চলিক ভাষায় ভাগ করার প্রস্তাবে কবি প্রবল আপত্তি জানালেন। এ ছাড়াও দেশী শিল্পের উন্নতির জন্য নানান দিক দিয়ে চিন্তা করতে লাগলেন। স্বদেশী জিনিস বিক্রির জন্য একটা দোকান খোলার কাজে যোগ দিলেন। আগরতলায় গিয়ে দেশীয় রাজাদের উদ্দেশ্যে একটা সম্ভাষণ দিলেন, তাতে বললেন, তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় যেন স্বদেশী শিল্পের উন্নতি হয়। এই তাঁর আশা। জাপানী শিল্পী ওকাকুরা ও সিষ্টার নিবেদিতার সঙ্গে মিলে ভারতীয় শিল্পকলার একটি কেন্দ্র স্থাপনের কাজে শিল্পী হ্যাভেল ও নিজের ভাইপো অবনীন্দ্রনাথকে অনেক সাহায্য করেন। এ সমস্ত দেশসেবার কাজ বই তো নয়।

এবার লোকে কবির একটা নতুন পরিচয় পেল। এরকম একজন অক্লান্ত কর্মী বড় একটা চোখে পড়ে না, বিশেষ করে আমাদের দেশে।

শান্তিনিকেতনের একেবারে হৃদয়ের মধ্যে নিজের জন্য রবীন্দ্রনাথ এমন একটা স্থান করে নিয়েছিলেন, যার প্রেরণাতে আশ্রমের জীবনে যেন কেউ রূপকথার সেই জিয়ন-কাঠি ছুঁইয়ে দিয়েছিল। কাজ হয়ে উঠেছিল যেন একটা রতের মতন। কি না করতে পারতেন শান্তি-নিকেতনের শিক্ষকরা আর তাঁদের গুরুদেব।

বই দরকার? বেশ, এই বই লিখে দিচ্ছি। অমনি বসে গেলেন পাঠ্য-পুস্তক লিখতে। এই ভাবে সরাসরি ইংরেজি শেখাবার জন্য 'ইংরাজি সোপান' লেখা হয়েছিল।

ছেলেরা উৎসবে অভিনয় করবে ? অমনি অপূর্ব সব নাটক রচনা হয়ে গেল, গুরু শিষ্যে মিলে সে সব অভিনয় করা হল, দেশের লোকে দেখে শুনে অবাক। দীর্ঘকাল ধরে কত যে নাটক লিখেছিলেন কবি ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। হালকা বিষয় নিয়ে খুবই কম। মজার কথা থাকলেও ছেলেমানুষী নেই প্রায় একটাতেও। আগেই বলা হয়েছে ছোটদের জন্য লিখতে হলেই, খোকামি দিয়ে বই ভরাতে হবে, একথা তিনি বিশ্বাস করতেন না। বর সবদা বলতেন ছোটদের সামনে উঁচু চিন্তা তুলে ধরলে তারা আপনা থেকেই বড় হয়ে উঠবে।

কত নাটক রচনা করেছিলেন, তার তালিকা দেওয়াই মুশকিল। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ', 'বিসর্জন', 'অচলায়তন', 'মুক্তধারা', 'রাজা ও রাণী' 'রাজা', 'নটীর পূজা', 'শ্যামা', 'রথের রশি', 'ফাল্গুনী', 'চণ্ডালিকা', আরো কত। এর মধ্যে কোনটির বিষয়বস্তুই ছোটদের জন্য বিশেষ করে নির্বাচিত হয় নি, কিন্তু কোনটির মর্মবাণী বুঝতে ছোটদের একটুকু কষ্ট হয় না। লেখা হলে পরে শান্তিনিকেতনের ছেলেরা এগুলি কত আনন্দের সঙ্গে অভিনয় করেছে। পটভূমিকা, আলোকসজ্জা, মাইক্রোফোনের অপেক্ষায় থাকে নি তারা, ফুল পাতা দিয়ে মঞ্চ সাজিয়ে, কণ্ঠের স্বর দিয়ে, সুর দিয়ে, সবাইকে মুগ্ধ করেছে। যখনকার কথা বলা হচ্ছে, তখনো অবশ্য এত গুলি নাটক লেখা হয় নি। সে সব আরও পরের কথা।

ষষ্ঠ অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের কাছে যাওয়া মানে ছিল একটা গানের পরিবেশের মধ্যে পড়ে যাওয়া। প্রকৃতির প্রতিটি ক্ষুদ্র পরিবর্তন, নীল আকাশের গায়ে একটুখানি মেঘ ভেসে যাওয়া, গাছের পাতার এতটুকু রঙ বদলানো, দুপুরে ঘন পাতার আড়াল থেকে একটুখানি পাখি ডাকা, অমনি সে সব গান হয়ে তাঁর কণ্ঠ থেকে ঝরে পড়ত।

এমন গান আর কেউ কখন শোনে নি। এ ধরাবাঁধা পথে চলা উচ্চাঙ্গের সংগীত নয়, সম্পূর্ণ নূতন এক জিনিস, মানে দিয়ে এত ভরপুর, সুর দিয়ে এমন মধুময়, যে সুর কথাকে সমৃদ্ধ করেছে, নাকি কথা করেছে সুরকে, তাই ভাবতে বসে যেতে হয়।

এত গান এ পৃথিবীতে আর কেউ কখনো রচনা করেছে বলে শোনা যায় নি। এমন অনুষ্ঠান নেই যার উপযুক্ত রবীন্দ্রসংগীত খুঁজে পাওয়া যায় না; এমন সুখ এমন দুঃখ নেই, যার মনের কথাটি কবি গানের মধ্যে প্রকাশ করেন নি। আর কিছু না লিখে, শুধু যদি গানগুলি রচনা করে যেতেন, তবুও লোকে নির্বাক বিস্ময়ে তাঁর দিকে চেয়ে থাকত।

কোথা থেকে যেন গানগুলি পেতেন; যেমনি কথা তৈরি হল, সুর বসানো হয়ে গেল, অমনি খুঁজে বেড়াতেন কাকে সে সুরটি শিখিয়ে দেওয়া যায়, নইলে নিজেই ভুলে যাবেন। বহুদিন পরে শান্তি-নিকেতনের ওই বিদ্যালয়ের একজন ছাত্র, নামকরা সাহিত্যিক, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী লিখেছিলেন যে শান্তিনিকেতনে এমনি এক সৃষ্টির উন্মাদনার সময়ে কবিকে দেখেছিলেন, মত্ত গজের মত কোথায় পা ফেলছেন না দেখে, জলকাদার মধ্যে দিয়ে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের খোঁজে চলেছেন। পাছে গানের সুরটি যায় হারিয়ে, তাই তর সইছে না। সে এমন দৃশ্য যা এ জীবনে ভোলা যায় না। সে গানটিতেও

এই কথাগুলি আছে, "হৃদয় আমার হয় বিবাগী, নিভৃত নীল পদ্ম লাগি।"

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে 'বন্দেমাতরম' গানটি লিখেছিলেন, তাতে সুর দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সে সুর শুনে সমস্ত শরীরে শিহরণ না লাগে, এমন মানুষ কমই আছে। নিজেও অজস্র দেশপ্রেমের গান লিখেছেন, বাংলা মাকে কত ভাবে, কত ভাষায়, কত বারংবার প্রণতি জানিয়েছেন।

'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি', 'বাংলার মাটি, বাংলার জল', এসব গান শুনলেও বুকে ভক্তির বান ডাকে। ওই দ্বিতীয় গানটি রাখী-বন্ধনের উৎসবের জন্য লিখেছিলেন।

সে এক দিন গিয়েছিল। বছরটি হল ১৯০৫, কবির বয়স চুয়াল্লিশ, ইংরেজ সরকার বাংলা দেশকে ভেঙে দু ভাগ করে দিয়েছেন, তাই মনে বড় ব্যথা ; ওই গান গেয়ে দল বেঁধে গঙ্গাস্নান করে আসা হল, রাখী বাঁধা হল সকলের হাতে, দোকানপাট সেদিন বন্ধ রইল, ঘরে ঘরে অরন্ধন। বিকেলে বিরাট সভা হল, আনন্দমোহন বসু হলেন সভাপতি, কবি তাঁর ইংরেজি ভাষণের বাংলা তখুনি করে দিলেন। তার পর শহরের মধ্যে দিয়ে বিশাল শোভাযাত্রা বেরোল, তারাও কবির লেখা গান গাইতে গাইতে চলল, 'বিধির বিধান কাটবে তুমি, এমনি শক্তিমান ?' দেশসেবার জন্য সেদিন পঞ্চাশ হাজার টাকা উঠেছিল। তার চাইতেও বড় কথা, স্বদেশ সম্বন্ধে যারা কখনো ভাবেনি, তারাও সেদিন থেকে ভাবতে শুরু করল।

ইংরেজরা দুশো বছর এ দেশ শাসন করে গেছে। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধ থেকে আরম্ভ করে, বিদেশী শাসকরা ১৮৫৭ সালে সিপাহী আন্দোলনে একটিবার মাত্র ব্যাঘাত পেয়ে, ততদিনে আরো প্রায় পঞ্চাশ বছর কাটিয়ে দিয়েছে। এবার দেশে যে আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে, তার কারণ অনেক গভীর, তার প্রসার অনেক ব্যাপক,

কারণ—এতদিনে দেশাত্মবোধ জেগেছে। এখন দেশপ্রেমিকরা যা কিছু করছেন সমস্ত ভেবে চিন্তে, যুক্তির সহায়তা নিয়ে, কেবলমাত্র রাগের মাথায় নয়। এ আরো অনেক গুরুতর ব্যাপার।

সমস্ত দেশটা যেন তার দেড়শো বছরের ঘুম থেকে গা মোড়ামুড়ি দিয়ে উঠল। যাঁরা তার কানে কানে জাগার মন্ত্র দিয়েছিলেন, কবি ছিলেন তাঁদের একজন। দেশের তরুণরা তাঁর দিকে পথনির্দেশের জন্য চেয়ে থাকত। কিন্তু দলাদলি ঝগড়াঝাটি তিনি আদৌ সইতে পারতেন না। দেশপ্রেমের নাম করে পরস্পরের সঙ্গে শত্রুতা করা তাঁকে বড় পীড়া দিত। অনেক পত্রিকাতে নির্ভীক ভাবে যেমন ইংরেজ সরকারের, ইংরেজ-ভক্তদের, আবার তেমনি নিস্তেজ আরাম-প্রিয় দেশবাসীদের ও সংকীর্ণ-মন গোঁড়াদের সমালোচনা করে অনেকের কাছে অপ্রিয় হয়েছিলেন। তারাও নানান কাগজে এমন ব্যক্তিগত ও অন্যায় ভাবে তাকে আক্রমণ করত যে কবির স্পর্শ-কাতর হৃদয় বেদনায় বিদীর্ণ হয়ে যেত।

ভালোবাসার লোকও ছিল মেলা। যাঁরা আশ্রমের কাজে লেগে-ছিলেন, তাঁরা যে তাঁর কত বড় বন্ধু ছিলেন, সে কথা তিনি বহুবার বহুস্থানে লিখে গেছেন ; আর ছিলেন যাঁরা, তাঁর আদর্শবাদের সহায়তা করেছেন, যেমন জগদীশচন্দ্র বসু, লোকেন পালিত, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি। তা ছাড়া আত্মীয় বন্ধুদের মধ্যে তাঁর নিবিড় একটি অন্তরঙ্গের দল গড়ে উঠেছিল, তাঁর উপর যাঁদের গভীর বিশ্বাস ছিল, তাঁর ভাইপো অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন এই দলের অগ্রণী।

মহর্ষির ভাই ছিলেন দু জন, মেজ ভাই গিরীন্দ্রনাথ ও ছোট ভাই নগেন্দ্রনাথ। নগেন্দ্রনাথের যখন মৃত্যু হয় তাঁর বয়স তখন ত্রিশেরও কম গিরীন্দ্রনাথ। ১৮৫৪ সাল অবধি বেঁচেছিলেন। তাঁর আবার দুই ছেলে, গণেন্দ্র আর গুণেন্দ্র। গণেন্দ্রও যৌবনে মারা যান। গুণেন্দ্রের তিন ছেলে ও কয়েকটি মেয়ে। বড় গুণী তাঁদের মধ্যে

কেউ কেউ, যেমন শিল্পী গগনেন্দ্র, অবনীন্দ্র ও সুনয়নী দেবী। সম্পর্কে তাই অবনীন্দ্র হলেন ভাইপো, বয়সে দশ বছরের ছোট। বড়ো গভীর ভালোবাসার সম্বন্ধ দু জনার মধ্যে, কাকার ইচ্ছা পালন করেই ভাইপো বড়ো সুখী। কিন্তু নিজেরও কম প্রতিভা ছিল না। তাতে কাকারও কোন হাত ছিল না, নিজের মত লিখতেন, ছবি আঁকতেন। এঁদের সকলকে পেয়ে কবির জীবনের একটা বড় ফাঁক ভরে গিয়েছিল।

অবনীন্দ্রনাথরা থাকতেন জোড়াসাঁকোতে একই পাঁচিলের মধ্যে, পাশের বাড়িটিতে, যেখানে আগে দ্বারকানাথের বৈঠকখানা ছিল। ওই বাড়িতে কত নাচগানের উৎসব হয়েছে। এখন সে বাড়ি ভেঙে ফেলে, সেখানে রবীন্দ্রভারতীর বাড়ি হয়েছে।

যাদের প্রতিভা থাকে, তাদের চরিত্রের মধ্যে সাধারণতঃ দুটি দিক দেখা যায়, যেন দুটো মানুষ তাদের মনে বাস করছে। একটা মানুষ বন্ধু-বান্ধব নিয়ে হৈ চৈ করে বেড়ায়, পৃথিবীর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকে। অন্য মানুষটা নিজের বুকের মধ্যে একলা বাস করে. জন্মেছে সে একা. মরবেও একা, বেঁচে থাকার কালেও তার মনের সুগভীর নৈঃসঙ্গ কেউ ঘোচাতে পারে না। শিল্পীরা, কবিরা, গাইয়েরা অনেক সময়ই এই রকম হন। রবীন্দ্রনাথও তাই ছিলেন। তাই পৃথিবীর সুখ দুঃখ তাঁর বড় একটা কিছু করতে পারত না। বারে বারে দেখা যেত এক সময় যাদের সঙ্গে গভীর অন্তরঙ্গতা, তাদেরও কেমন অকাতরে ছেড়ে যাচ্ছেন।

কবিদের এই নিঃসঙ্গ জীবনের একমাত্র সেই সঙ্গী থাকে, তাঁরা যাকে সত্য বলে জেনেছেন। তাকে বিশ্বাসও বলা যায়, ভগবানও বলা যায়। রবীন্দ্রনাথেরও সেই সুগভীর বিশ্বাস ছিল, যা তাঁকে দুঃখে বল দিত, সুখে রক্ষা করত। সারাজীবন ধরে যখন যা লিখেছেন, কি গদ্যে, কি পদ্যে, কি গানে, সবটার মধ্যে একটা সুন্দর সামঞ্জস্য

দেখা যায়, সবই যে তাঁর হৃদয়ের সেই চিরন্তন সত্যের প্রকাশ। তাই বলে সব সময়ই যে এই কথা বলে গেছেন তাও নয়। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যেমন বুদ্ধি বিবেচনার পরিণতি হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে মতামতগুলোকেও শুধরে নিয়েছেন। আগে যে কথা বলেছেন, পরে যদি সেটাকে ভুল বলে মনে হয়েছে, তাও তখুনি স্বীকার করেছেন। এতে তাঁর সত্যনিষ্ঠাই বারংবার প্রমাণ হয়েছে। যা তিনি বিশ্বাস করতেন না, সে কথা লেখা বা বলা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল।

চরিত্রের এই দৃঢ়তার জন্য তাঁকে কম কষ্ট পেতে হয় নি, কত সময় ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাও তাঁকে ভুল বুঝেছিলেন। জাতীয়তা আন্দোলনের নেতাদের মধ্যে স্থান নিয়েছিলেন তিনি, কিন্তু ক্রমশঃ লক্ষ্য করলেন জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে একটা অসহিষ্ণুতা ও সংকীর্ণতা দেখা দিচ্ছে, মনে হল যেন সাম্প্রদায়িকতার ভাবটাও বেড়ে যাচ্ছে। ক্রমে এও বুঝলেন যে এখানে তাঁর স্থান নেই, তখুনি সরে দাঁড়ালেন। দেশপ্রেম ও দেশের মঙ্গল চিন্তা এতটুকু কমল না, তবুও রাজনৈতিক আন্দোলনের কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে পড়লেন। সারা জীবন দেশের কাজ করে গেলেন, কিন্তু আর আন্দোলনে নিজেকে জড়ালেন না। শান্তিনিকেতনে শান্তির আশায় অপেক্ষা করে থাকলেন।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রবাসী' পত্রিকাতে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তার নাম 'ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার'; তাতে তখনকার রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের দুর্বলতা কোথায় দেখিয়ে দিয়েছেন, দেশবাসীদের সম্পূর্ণ একটা মনের পরিবর্তন চেয়েছেন, সমাজসেবা দিয়েই দেশের কল্যাণ হয় এই নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু এরকম কথা তখনকার সেই গরম মুহূর্তে কেই বা শুনতে চেয়েছিল! এমন কি তাঁর বন্ধু ও সুহৃদ সুপণ্ডিত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এই প্রবন্ধের একটা পালটা জবাবও দিয়েছিলেন। কিন্তু কবির নিঃসঙ্গ পথে তাঁর অন্তরের বিশ্বাসই যথেষ্ট পাথেয় ছিল।

এর পরই ভারি সমৃদ্ধ একটি সৃষ্টির পর্ব শুরু হয়ে গেল। আঘাত পেলেই রবীন্দ্রনাথের হৃদয় মন ও লেখনী খুলে যেত। তখনকার অপূর্ব সব রচনার মধ্যে একটা প্রচণ্ড বলিষ্ঠতা, একটা অন্ধকার-ভেদ-করা দূরদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীঅরবিন্দকে তখনি চিনে নিয়ে, 'অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার' বলে একটা অবিস্মরণীয় কবিতা লিখেছিলেন। 'গোরা' নামে একটা সামাজিক উপন্যাস লিখেছিলেন, তাতে সব রকম সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ করা আছে। 'শারদোৎসব' ও 'প্রায়শ্চিত্ত' লেখেন, 'গীতাঞ্জলি'র কবিতা রচনা করতে থাকেন।

সঙ্গে সঙ্গে সাংসারিক কর্তব্যগুলিও নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে যান, তবে সংসারে তাঁর কোনো মোহই ছিল না। ছোট মেয়ে মীরার বিয়ে দিয়ে জামাই নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে কৃষিবিদ্যা শিখবার জন্য আমেরিকা পাঠালেন।

নিদারুণ একটা শোকও পেয়েছিলেন, ছোট ছেলে শমীন্দ্র মুঙ্গেরে বেড়াতে গিয়ে সেইখানেই হঠাৎ মারা যায়। কবিরা কেমন করে গভীরতম দুঃখকে বরণ করে নিতে পারেন ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। এই মৃত্যুর পঁচিশ বছর পরে, তাঁর একমাত্র নাতির তরুণ বয়সে মৃত্যুও তাঁকে কম ব্যথা দেয় নি। সেই সময় মেয়েকে সান্ত্বনা দিয়ে অপূর্ব একখানি চিঠি লিখেছিলেন। তাতে লিখছেন,

"শমী যে রাত্রে গেল, তার পরের রাত্রে রেলে আসতে আসতে দেখলুম জ্যোৎস্নায় আকাশ ভেসে যাচ্ছে, কোথাও কিছু কম পড়েছে তার লক্ষণ নেই। মন বললে কম পড়ে নি—সমস্তর মধ্যে সবই রয়ে গেছে, আমিও তারি মধ্যে। সমস্তর জন্য আমার কাজও বাকি রইল। যত দিন আছি সেই কাজের ধারা চলতে থাকবে। সাহস যেন থাকে, অবসাদ যেন না আসে, কোনখানে কোনো সূত্র যেন ছিন্ন হয়ে না যায়—যা ঘটেচে তাকে যেন সহজে স্বীকার করি, যা কিছু

রয়ে গেল তাকেও যেন সম্পূর্ণ সহজ মনে স্বীকার করতে ত্রুটি না ঘটে।"

পরম দুঃখকে এমন করে যিনি গ্রহণ করতে পারেন তাঁর মধ্যে যে প্রবল পৌরুষ বিরাজ করছে, সে সব মানুষের নমস্য। রবীন্দ্রনাথ লম্বা চুল রাখতেন, মাঝে মাঝে রঙচঙে জাব্বা-জোব্বা পরতেন, কেউ গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিলে, তখুনি লজ্জা পেয়ে খুলে ফেলতেন না। দূর থেকে এসব কথা শুনে লোকে ভাবত কবির বুঝি মেয়েলী স্বভাব। কিন্তু যেমনি কাছে যাওয়া, তাঁর বজ্রগম্ভীর স্বর শুনে, তাঁর দৃঢ় বাহুখানির দিকে একবার তাকিয়ে, তাঁর ওই প্রবল পৌরুষের কাছে সকলে মাথা নত করত। কিন্তু ওই প্রচণ্ডতার সঙ্গে সঙ্গে কি অপূর্ব কোমলতাও ছিল, কি সহানুভূতি, কি সমবেদনা, ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। শক্তি শুধু তাঁর কলমে ছিল না, তাঁর চরিত্রে তাঁর সমস্ত দেহ মনে বিরাজ করত, তাঁর চোখের দৃষ্টি থেকে বিচ্ছুরিত হত।

কি সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যে একবার দেখত সে আর কখনো ভুলত না। কখনো স্বচ্ছ দীঘির জলে সূর্যের আলো পড়লে যেমনি হয়, তেমনি টলমল করত। আবার অন্যায় দেখলে সেই চোখ থেকেই যেন বিদ্যুৎ ঝলকাত, অপরাধীরা ভয়ে কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে যেত।

বড় সুন্দর চেহারা ছিল বুড়ো বয়স অবধি, অমনটি আর দেখা যায় না। মাথায় ছয় ফুটের বেশিই মনে হত, শক্ত সুঠাম দেহখানি, ফরসা রঙ, উঁচু নাক, আয়ত চোখ, কোঁকড়া চুল। কবির যখন চব্বিশ পঁচিশ বছর বয়স, তখন লেখক দীনেশ সেন, তাঁকে দেখে একজনকে লিখেছিলেন,

"ঠাকুরবাড়ির প্রকাণ্ড পুরীতে প্রবেশ করিয়া, দোতলার সিঁড়ির মুখেই রবি ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ হইল।······দেহছন্দ সুদীর্ঘ, বর্ণ বিশুদ্ধ গৌর, মুখাকৃতি দীর্ঘ, নাসা চক্ষু ভ্রূ সমস্তই সুন্দর, যেন তুলিতে আঁকা। গুচ্ছে গুচ্ছে কয়েকটি কেশতরঙ্গ স্কন্ধের উপর আসিয়া

পড়িয়াছে। পরিধানে ধুতি। কেন বলিতে পারি না, রবিঠাকুরের অপূর্ব মূর্তি দেখিয়া বোধ হইল যেন এই অঙ্গে গৈরিক বসন অধিক শোভা ধারণ করিত।······রবিঠাকুরের বয়স অল্প······কিন্তু স্বভাব স্থির।······তাঁহাকে একটি গান গাহিতে অনুরোধ করা হইল। সাধাসাধি নাই, বনবিহঙ্গের ন্যায় স্বাধীন উন্মুক্ত কণ্ঠে অমনি গান ধরিলেন।"

ঠাকুরবাড়ির সেই 'কালো ছেলে'কে দেখে লোকে এমনি মুগ্ধ হত। তারপর সেই প্রথম দেখা যখন ঘনিষ্ঠতায় দাঁড়াত, তাঁর চরিত্রের শত শত গুণ দেখে মুখে কারো কথা সরত না।

সপ্তম অধ্যায়

কবি নিজে রাজনৈতিক আন্দোলন ছাড়লেও, দেশবাসীরা তাঁকে ছাড়বে কেন? ১৯০৮ সালে পাবনাতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সভার অনুষ্ঠানে তাঁকে সভাপতিত্ব করতে হল। তিনি দেশের যুবকদের তাঁর ভাষণে এই কথাই বলেছিলেন যে, যাও, দল বেঁধে গ্রামে গ্রামে কাজ করগে যাও, হিন্দু মুসলমানে ভেদ রেখো না, গ্রামের উন্নতি কর, পথ-ঘাট বানাও, বিদ্যালয় স্থাপন কর। সেই তো দেশের সেবা।

ওই বছরেই মজঃফরপুরে স্বদেশীরা বোমা ফেলেছিল, তারপর কলকাতায় বোমা তৈরির একটি কারখানাও আবিষ্কার হল, শ্রীঅরবিন্দের ভাই বারীন ঘোষ দলসহ ধরা পড়লেন। কবি বুঝলেন, শাসকদের অত্যাচারের ফলেই এমন হয়েছে। বীর দেশপ্রেমিকদের শ্রদ্ধা জানালেন, তবু বললেন এ পথ নয়। এই বিষয় 'প্রবাসী'তে কয়েকটি প্রবন্ধও লিখেছিলেন, 'পথ ও পাথেয়', 'সদুপায়', 'পূর্ব ও পশ্চিম' ইত্যাদি। খ্যাতির বিড়ম্বনাই হল এই যে বিরুদ্ধ সমালোচনার পাত্র হতে হয়। অখ্যাত লোককে কেউ আক্রমণ করতে চায় না, বিখ্যাত সমালোচক সাহিত্যিকরা তো নয়ই। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় নানান পত্রে পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের রচনার তিক্ত সমালোচনা ছাপাতে লাগলেন। সেগুলিতে এমন ব্যঙ্গ মেশান ছিল যে পুরনো বন্ধুর এই শ্লেষপূর্ণ আলোচনায় কবি বড় দুঃখিত হলেন। শোনা যায় 'সোনার তরী' নামের বিখ্যাত মধুর কবিতাটিও রেহাই পায় নি। যে শব্দগুলি সাধারণের কানে মধু বর্ষায়—'চারিদিকে বাঁকা জল করিছে খেলা'—সেগুলি নিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল বিদ্রূপ করেছিলেন। আরো অনেক গুরুতর কথাও বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের রচনায় সব জায়গায় মানে বোঝা যায় না, তা ছাড়া দুর্নীতিতে পূর্ণ ইত্যাদি।

বন্ধুদের অনুরোধে পরে কবি এর একটি উত্তর দিলেও, তাঁর সাহিত্য রচনার উপর এ সব নির্মমতার কোন প্রভাব দেখা গেল না।

১৯০৯ সালে কবির ছেলে রথীন্দ্রনাথ আমেরিকায় তিন বছর কৃষিবিদ্যা শিখে ফিরে এলেন। কিছুদিন পরেই, অবনীন্দ্রনাথের ভগ্নী বিনয়নী দেবীর বালবিধবা কন্যা প্রতিমা দেবীর সঙ্গে কবি ছেলের বিবাহ দিলেন। 'গোরা' বইখানি কবি ছেলেকে উৎসর্গ করেছিলেন। এর চাইতে উন্নত পৌরুষের চিত্র কোন কালে কোন বাপ তাঁর আদরের পুত্রের সামনে তুলে ধরতে পারবেন না।

এই সব ঘটনার বছর খানেক পরে রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের প্রথম অনুবাদ 'মডার্ণ রিভিউ'তে প্রকাশিত হয়। এই তর্জমাগুলি লোকেন পালিত করেছিলেন। এতে করে বাংলার বাইরেও কবির গল্পের সমাদর হবার একটা সুযোগ হল।

কবির এখন পঞ্চাশ বছর বয়স। সেবার শান্তিনিকেতনে তাঁর জন্মোৎসব পালন করা হল; কবির লেখা 'রাজা' অভিনয় হল, নিজে 'ঠাকুরদা' সাজলেন। জীবনের অর্ধেকের বেশি কেটে গেছে, কবি এবার নিজের শৈশব ও প্রথম যৌবনের স্মৃতিকথা লিখে বন্ধুবান্ধবদের পড়ে শোনালেন, পরে সেগুলি 'জীবনস্মৃতি' নামে প্রকাশিত হল।

ততদিনে বাগদেবীর সিংহাসনের পাশেই যেন কবির আসন পাতা হয়ে গেছে। 'অচলায়তন' নাটক লেখা হল ও প্রকাশিত হল, অমনি গোঁড়ারা গেলেন চটে, কারণ এই নাটকে গোঁড়ামির আর অর্থশূন্য নিয়মপালনের নিন্দা আছে। আবার প্রকৃত ধর্ম কাকে বলে তারও ইঙ্গিত দেওয়া আছে।

'ডাকঘর' রচনা হল। ছোট ছেলে অমল রোগশয্যায় শুয়ে জানলা দিয়ে কেমন করে পৃথিবীকে ও পৃথিবীকে যিনি চালান তাঁকে চেনে তারই করুণ মধুর নাটিকা; সকলে মুগ্ধ ব্যাকুল হয়ে উঠল।

কলকাতায় সে বছর ভারতীয় জাতীয় অধিবেশন হল। সেই

উপলক্ষে কবি তাঁর অবিস্মরণীয় গান 'জন-গণ-মন-অধিনায়ক' রচনা করলেন, সেই গান আজ আমাদের জাতীয় সংগীত বলে স্বীকৃত হয়েছে। সে কি কম গৌরবের কথা!

১৯১১ সালের মে মাসে কবির পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হয়েছে, পরের বছর জানুয়ারী মাসে কলকাতার টাউন হলে মহা ঘটা করে দেশবাসীরা তাঁর জন্মোৎসব পালন করল। সমস্ত দেশ যেন সেখানে জড়ো হল, তার আগে কখন কোন সাহিত্যিককে এ দেশে এমন করে সম্বর্ধনা দেওয়া হয় নি। কে না গিয়েছিল, যাদের ধন, বল, বিদ্যা, খ্যাতি, সম্মান, উচ্চপদ তাঁরা তো ছিলেনই, তার চাইতেও অনেক বড় কথা, হাজার হাজার অখ্যাত স্বদেশবাসীরা কবিকে তাঁদের শ্রদ্ধা জানাবার জন্য ভিড় করে এসেছিলেন। এই প্রথম এমনভাবে কবিকে দেশের শিরোমণি বলে স্বীকার করা হল। পুরনো বন্ধু পণ্ডিত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী অপূর্ব ভাষায় সকলের প্রতিনিধি হয়ে কবিকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়েছিলেন।

দেশের লোকে তো তাঁকে এতদিনে খানিকটা চিনেছেই, অজিত চক্রবর্তী তাঁর কয়েকটি কবিতার ইংরাজি অনুবাদ করে দেশের বাইরেও তাঁর পরিচয়ের পথ খুলে দিয়েছিলেন।

চিরদিন রবীন্দ্রনাথ ঐক্যমন্ত্রে বিশ্বাস করে এসেছেন। হিন্দু মুসলমান ভেদ তাঁকে পীড়া দিয়েছে। তাঁদের পরিবার ছিল ব্রাহ্ম সমাজের নেতাস্থানীয়, হিন্দু ও ব্রাহ্মও যে পৃথক নয়, এই নিয়ে ব্রাহ্মদের কাছেও বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তাতে অনেক ব্রাহ্ম তাঁর উপর রুষ্ট হয়েছিলেন, 'তত্ত্বকৌমুদী'তে তাঁর কথার প্রতিবাদ করেছিলেন।

এই সময় তাঁর 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা' লেখা হয়, তাতে তিনি প্রমাণ করতে চাইছেন যে ভারতের ধর্মই হল ভিন্ন ভিন্ন মতকে আপন করে নেওয়া।

এত কাজের মধ্যে শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের কিন্তু কোন অযত্ন

হয় নি। বিরুদ্ধবাদীদের প্ররোচনায়, কোন কোন প্রাদেশিক সরকার এই মত দিয়েছিলেন যে ওখানকার শিক্ষাদীক্ষা সরকারী কর্মচারীদের ছেলেদের উপযুক্ত নয়। অথচ ঠিক সেই সময়েই ফেল্পস্ নামে একজন আমেরিকান এ দেশে এসে সব দেখে শুনে বলেছিলেন যে শান্তিনিকেতনে প্রকৃত মানবতার শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে।

ক্রমে কবির মনে হতে লাগল তাঁর শিক্ষার আদর্শের কথা দেশ বিদেশকে জানানো দরকার নইলে কাজ সম্পূর্ণ হয় না। এই উদ্দেশ্যে ১৯১২ সালে পুত্র ও পুত্রবধূকে সঙ্গে নিয়ে কবি তৃতীয়বার য়ুরোপে গেলেন।

এখন বয়সের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠালাভও হয়েছে; এবার যে ইংলেণ্ডের পরিচয় পাবার সুযোগ হল, সে সেই তরুণ ছাত্রের চোখে দেখা বিলেতের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

গিয়ে তো এক হোটেলে উঠে, শিল্পী রথেন্‌স্টাইনের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। রথেন্‌স্টাইন এর আগে ভারতে এসেছিলেন, অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখাশুনা হয়েছিল। রথেন্‌স্টাইন রবীন্দ্রনাথের কবিতার ইংরেজি অনুবাদ পড়ে মুগ্ধ হয়ে, সেগুলি কবি ইয়েটস্, সাহিত্যিক স্টপফর্ড ব্রুক ও ব্র্যাড্‌লিকে দেখালেন। তাঁরাও উল্লসিত হয়ে উঠলেন।

রথেন্‌স্টাইনের বাড়িতেই ওখানকার সাহিত্যজগতের যাঁরা নেতা-স্বরূপ, তাঁদের ডেকে ইয়েটস্‌ই কবিতাগুলি পড়ে শোনালেন। সেইখানেই এণ্ড্রুজ্ সাহেবের সঙ্গে কবির প্রথম দেখা, যে এণ্ড্রুজ পরে এ দেশে এসে কত কাজ করে গেছেন।

এবার কবির সঙ্গে বিলেতের বহু জ্ঞানীগুণী চিন্তাশীল লোকদের পরিচয় হল। ওদের দেশের লোকেরা কেমন করে থাকে, কথা বলে, চিন্তা করে, তাদের বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করে কিছু আর তাঁর অজানা রইল না। 'রাজা' ও 'ডাকঘর' এই দুটি নাটকেরও ইংরেজি

অনুবাদ প্রকাশিত হল। এমনি করে বিদেশেও কবির অনেক ভক্ত বন্ধু লাভ হল।

তারপর দেশে ফিরে এলেন। এসেই এখানকার কাজ আরো প্রসারিত করলেন। শান্তিনিকেতন থেকে সামান্য দূরে সুরুল গ্রামে পুরনো একটি নীলকুঠির বাড়ি ও জমিজমা কিনে ফেললেন। এইখানেই পরে গ্রাম উন্নয়নের কেন্দ্র হল।

কিন্তু বিদেশের কাজ তো শেষ হয় নি, সবে মাত্র ইংল্যাণ্ড যাওয়া হয়েছে। সেই বছরের শেষের দিকে আমেরিকা গিয়ে, নানান জায়গায় বক্তৃতা ইত্যাদি দেবার সুযোগ পেলেন।

নভেম্বর মাসে লণ্ডনে তাঁর ইংরেজী গীতাঞ্জলি প্রকাশিত হল। এ বই বাংলা গীতাঞ্জলির হুবহু অনুবাদ নয়, এর মধ্যে 'নৈবেদ্য', 'খেয়া', আর 'গীতাঞ্জলি' থেকে কয়েকটি কবিতা বেছে নিয়ে ইংরেজিতে তর্জমা করা হয়েছে। ইংরেজ পাঠকরা সাদরে বইটিকে গ্রহণ করল। দেখতে দেখতে আরো অনুবাদ বেরোল, 'গার্ডনার' ও 'ক্রেসেণ্ট মুন' আর 'চিত্রা' নাম দিয়ে 'চিত্রাঙ্গদা'।

ভাগ্যদেবী যখন কারো উপরে প্রসন্ন হন, ঠিক মনে হয় যেন তাঁকে আর ধরে রাখা যাচ্ছে না। তখনকার বড়লাট রবীন্দ্রনাথের বিষয় এশিয়ার সভাকবি বলে উল্লেখ করেছিলেন। লাট সাহেবের বাড়িতে সেই সভায় এণ্ড্রুজ সাহেব কবির জীবনী ও সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেছিলেন।

১৯১৩ সালের অক্টোবর মাসে কবি দেশে ফিরলেন, আর নভেম্বর মাসে শুনলেন, ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি' রচনার জন্য তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। সুইডেনের একজন মহানুভব ব্যক্তি বছরে বছরে নানান ক্ষেত্রের শ্রেষ্ঠ কর্মীদের জন্য এই পুরস্কারের ব্যবস্থা করে গেছেন। পাত্র নির্বাচন করেন সুইডিস্ একাডেমি।

সুখবর শুনে দেশের লোকেও আনন্দিত হয়ে উঠল। একদল

গেল শান্তিনিকেতনে কবিকে অভিনন্দন জানাতে। তারা গিয়ে দেখল নিজের দেশ যে স্বীকৃতি তাঁকে দেয় নি, বিদেশ থেকে সেই স্বীকৃতি আগে পেয়ে কবির মন তিক্ততায় ভরে আছে। এই নিয়ে কেউ কেউ কবির উপর অসন্তুষ্টও হয়েছিলেন।

পরের বছর বিশ্ববিদ্যালয় এই স্কুল-পালানো ছেলেটিকে 'ডি-লিট' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন। কবি নিশ্চয়ই মনে মনে খুব খানিকটা হেসেছিলেন!

অষ্টম অধ্যায়

বঙ্গাব্দ ১৩৩১, ১লা বৈশাখ, সুরুলে কেনা সেই কুঠিবাড়িতে একটা বিজ্ঞানাগার খোলা হল। সেখানে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি আনা হল, গবেষণার কাজ শুরু হল। এ সব গবেষণা কৃষিবিদ্যা ও কি করে ভালো ফসল হয়, এই সব বিষয় নিয়ে হত।

কাজের সঙ্গী পেয়েছিলেন কবি এণ্ড্রুজ ও পিয়ার্সন সাহেবকে। মাঝে আবার তাঁরা দুজন একবার আফ্রিকাতে কিছুদিন কাজ করে এলেন। সেখানেও ঘোর অন্যায় ও অশান্তির দিন যাচ্ছে, শ্বেতাঙ্গরা কালো মানুষদের উপর অভাবনীয় অত্যাচার করছে। তার প্রতিবাদ করবার জন্য যাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী বলে একজন ক্ষীণকায় যুবকও ছিলেন। এঁর কাজের সহায়তা করবার জন্যেই ওঁদের আফ্রিকা যাওয়া।

শান্তিনিকেতনের কাজের মধ্যে এণ্ড্রুজ ও পিয়ার্সন যে কি ভাবে নিজেদের ডুবিয়ে দিয়েছিলেন, ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। চমৎকার বাংলা শিখেছিলেন পিয়ার্সন, এমন কি যখন ওখানে 'অচলায়তন' মঞ্চস্থ হল, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সঙ্গে পিয়ার্সনও অভিনয় করলেন।

এখন শান্তিনিকেতন বিদেশীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, যে-ই কবিকে দেখে, প্রথমে তাঁব বচনাব মাধুর্যে, তারপর তাঁর দেহের সৌন্দর্যে, তারপরে তাঁর ব্যক্তিত্বের সবলতায় আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। এই ভাবে একজন আরব কবিও শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন, তাঁর নাম বাস্তানি, রবীন্দ্রনাথের কবিতার ইংরেজি অনুবাদ নিয়ে তাঁদের আরবী ভাষাতে তর্জমা করেছেন, আবার ওই আরবী থেকে কবিতাগুলি তখন নানান মধ্য-য়ুরোপীয় ভাষাতেও অনুবাদ হচ্ছে। এমনি

করে সারা পৃথিবীর লোকে বাঙালী কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম জানল।

এদিকে দেশের লোকে যে বলত শান্তিনিকেতনের ব্যাপারই আলাদা, ওখানে যেমনি গুরু, তার তেমনি চেলা। সে কথাটার মধ্যে অনেকখানি সত্যিও ছিল। ওখানেই কবি নিজের মনের আশা, মনের স্বপ্নকে মূর্তি দিতে চেষ্টা করতেন।

বকাঝকা ভালোবাসতেন না। মাঝে মাঝে দুষ্টু ছেলেদের ধরে মাস্টারমশাইরা গুরুদেবের কাছে নিয়ে আসতেন। শাস্তি দেবার জন্যে। গুরুদেব তখন পড়ে যেতেন মহা ফাঁপরে। তাঁর মনে হত যেন তাঁর নিজের ছোটবেলাকার সমস্ত অপরাধগুলো সারি সারি দাঁড়িয়ে গিয়ে, দাঁত বার করে হাসছে। আর শাস্তি দেওয়া হয়ে উঠত না।

কবির বিষয় আরেকটা মজার গল্প শোনা যায়। একবার দারুণ বর্ষা নেমেছে, ছেলেরা পড়াশুনো ছেড়ে, ঘরের আশ্রয় ছেড়ে ছুটে বাইরে বেরিয়ে, জলে ভিজছে আর গান গাইছে, কিছুতেই বারণ শুনছে না। বেগতিক দেখে মাস্টারমশাইরা গেলেন গুরুদেবের কাছে। তিনি তাঁদের সেখানে বসিয়ে রেখে নিজে গেলেন ছেলেগুলোকে শাসন করতে।

মাস্টারমশাইরা বসে থেকে থেকে শুনতে পেলেন ছেলেদের জলে ভেজার হৈ চৈ থেমে না গিয়ে যেন দ্বিগুণ বেড়ে গেল, আর ধৈর্য রাখতে না পেরে, তাঁরাও গেলেন সেখানে। গিয়ে দেখেন, চেলাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে গুরুও ভিজছেন আর বর্ষার গান গাইছেন। অমন দৃশ্য দেখা কারো ভাগ্যে বড় একটা ঘটে না।

প্রথম প্রথম লোকে সহজে ওখানে ছেলে ভরতি করতে চাইত না, এ কথা ঠিক। কিন্তু কেউ যদি চাইত, তাকে এক কপি ছাপা

নিয়মাবলী পাঠানো হত, যেমন নিরামিষ খেতে হবে, খালি পায়ে থাকতে হবে ইত্যাদি।

সেই সঙ্গে কি কি জিনিস নিয়ে যেতে হবে তারও একটা তালিকা থাকত। তালিকাটিতে থাকত, পাঁচখানা কাপড়, তিনখানা করে গেঞ্জি ও জামা, তারপর বিছানা মশারি—দারুণ মশার উপদ্রব ছিল সেকালে—আবার একজোড়া পট্টবস্ত্রও নিতে হত, উপাসনা ইত্যাদির জন্য। একটা গাড়ু, একখানা করে থালা, বাটি, গেলাস, একটা টিনের তোরঙ্গ। অর্থাৎ কিনা যেটুকু না হলেই নয় সেইটুকুই নিতে হত। বিদ্যালয়ের এমন অবস্থা ছিল না যে সংসারের দরকারি জিনিসটুকুও যোগাতে পারবে। এর উপর এক বাক্স ছুতোরের হাতিয়ার নিতে হত, হাতের কাজ শিখতে হত সকলের। ছাত্ররা বাইরে থেকে শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে নানান অদ্ভুত গল্প শুনে ভয়ে ভয়ে পৌঁছেই, গুরুদেবকে দেখে মুগ্ধ হয়ে যেত।

শ্রীযুক্ত সুধীররঞ্জন দাশ, যিনি পরে ভারতের প্রধান বিচারপতি ও তারপরে এই শান্তিনিকেতনেরই উপাচার্য হলেন. তিনিও ছিলেন ওখানকার ছাত্র। তাঁর পিসতুতো দাদারা তাঁকে ভয় দেখিয়েছিল, যাও না একবার সেখানে, ওদের এক গুরুদেব আছেন, তোমার মত ছেলেদের পিটিয়ে তিনি সোজা করেন।

কিন্তু সেখানে পৌঁছে যখন অতিথিশালার দোতালায় উঠে গুরুদেবের সামনে দাঁড়ালেন, দেখলেন বেশ লম্বা চেহারার মধ্যবয়সী একজন লোক, চুলে দাড়িতে পাক ধরেছে, পরণে সাদা থান ধুতি, লংক্লথের পাঞ্জাবি, পায়ে নাক ওলটানো লাল চটি, নাকে স্প্রিং লাগানো চশমা, গলার চারিদিকে কালো ফিতে দিয়ে ঝোলানো। হাত দুটি ভারি বলিষ্ঠ, এক কালে এই হাতে পদ্মায় নৌকোর দাঁড় টেনেছেন। আর সে যে কি মিষ্টি গলা! দেখে শুনে সেই মুহূর্তেই এই নতুন ছাত্রটি চিরকালের মত গুরুদেবের ভক্ত হয়ে গেলেন।

সাধারণ স্কুলের বাঁধাধরা নিয়ম এখানে চলত না, তাই বলে যে এখানকার জীবনে কোনো শৃঙ্খলা ছিল না, তা নয়। যথাসময়ে পরিপাটি করে নিজেদের কাজ নিজেদের করে নিতে হত। ঘর দোর পরিষ্কার রাখতে হত, জিনিসপত্রের যত্ন করতে হত, কালি কলম পেনসিল নিব সাবান ইত্যাদি বিদ্যালয় থেকে দেওয়া হত, অভি-ভাবকরা দাম দিতেন। কিন্তু পুরনোটার কি হল তার একটা কৈফিয়ত না দিতে পারলে, নতুন জিনিস পাওয়া যেত না।

তক্তপোশে শুত ছেলেরা। বাক্সটা তারই নীচে থাকত। মাস্টার-মশাই একজন ঘরে থাকতেন, দেখাশুনা করতেন। স্বাবলম্বী হতে শেখানো হত, কিন্তু কারো অযত্ন করা হত না।

সব সময় চেষ্টা করা হত যাতে দেশের প্রতি ছেলেদের ভক্তি বাড়ে আর বিলাসিতার দিকে মন না যায়। মাস্টারমশাইদের ভালোবাসা ও ভক্তি করা, বেদ মন্ত্র মুখস্থ করা, ভগবানের নাম নিয়ে প্রতিদিনকার পাঠ আরম্ভ করা, এই সবই ছিল ওখানকার শিক্ষাব অঙ্গ। এর ফলে ছেলেদের মনে একটা নিষ্ঠার ও বলিষ্ঠতার সৃষ্টি হত, যা তাদের চিরদিনের পাথেয় হয়ে থাকত।

এমনি করে আস্তে আস্তে ১৯১৪ সাল এসে গেল। নোবেল প্রাইজের পাওয়া এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকার সবটাই কবি আশ্রমের কাজের জন্য দিয়ে দিয়েছিলেন। লেখার কাজও সমানে চলতে থাকল। ইন্দিরা দেবী হলেন কবির মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের কন্যা, কবির বড় আদরের ভ্রাতুষ্পুত্রী। রূপে গুণে অসাধারণ, তার উপর পরম বিদূষী। তাঁর স্বামীর নাম প্রমথ চৌধুরী। সাহিত্য জগতে 'বীরবল' নামে খ্যাত, উঁচু দরের প্রতিভাসম্পন্ন লেখক। এঁরা দুজনে ছিলেন কবির বড় প্রিয় পাত্র। 'ছিন্নপত্রের' চিঠি-গুলোর অধিকাংশ ইন্দিরা দেবীকেই লেখা। প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় 'সবুজপত্র' নামে একটি নতুন মাসিকপত্র বেরোতে

লাগল। তাতে কবির অজস্র গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে লাগল।

সমালোচকরা, নিন্দুকরা এখনো রবীন্দ্রনাথকে ছেড়ে কথা কইতেন না, তিনিও নির্ভীক ভাবে যাঁরা সমাজসেবার নামে নিজেদের নাম জাহির করে বেড়াতেন তাঁদের সমালোচনা করে যেতে লাগলেন। 'লোকহিত' নামে একটি প্রবন্ধ পড়ে দেখবার মত।

তারপর বাধল প্রথম মহাযুদ্ধ, একদিকে জর্মানি ও তার বন্ধুরা, অপর দিকে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ। ভারত তখনো পরাধীন, তার মতামতের অপেক্ষায় কেউ রইল না। যুদ্ধ বাধার খবরে দেশের চিন্তাশীল লোকরা বিমর্ষ হয়ে পড়লেন। কবি শান্তিনিকেতনের মন্দিরে মর্মস্পর্শী ভাষণ দিলেন। তারপর এই বিষয়ই 'মা মা হিংসী' নামে প্রবন্ধ লিখলেন।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যরচনা কিন্তু ব্যথা-বেদনার মধ্যে থেকে যেন প্রেরণা পেত। এই সময়ে দেড় মাসের মধ্যে 'গীতালি'র একশো গান লিখেছিলেন, 'বলাকা'র অনেকগুলি কবিতা লিখলেন, গোটা দুই ছোট গল্প লিখলেন, তার একটির ইংরেজি অনুবাদও করলেন।

এবার কবির জীবনে একটি নতুন প্রভাব ও একজন চিরকালের বন্ধুর আগমন হল। তাঁর নাম মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। এণ্ড্রুজ ও পিয়ার্সন যাঁর কাজের সাহায্য করবার জন্য আফ্রিকা গিয়েছিলেন।

আফ্রিকার ট্রান্সভাল প্রদেশে গান্ধীজী "ফীনিক্স স্কুল" বলে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যুদ্ধের প্রতিক্রিয়াতে ও অন্যান্য অসুবিধার ও অত্যাচারের কারণে তখনকার মত আফ্রিকাতে এই বিদ্যালয় চালানো মুশকিল হয়ে উঠেছিল।

এণ্ড্রুজের মুখে কবি ছাত্রদের ও তাদের অধ্যাপকদের শান্তিনিকেতনে আসবার জন্য নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন। এলেন তাঁরা। এখানকার ছেলেদের সঙ্গে মিলেমিশে কাজও শুরু হল।

ওই ছেলেরা অনেক কঠিন জীবনে অভ্যস্ত ছিল, স্বার্থত্যাগও অনেক করেছিল। তাদের কাছ থেকে প্রেরণা পেয়ে শান্তিনিকেতনের ছাত্ররা চিনি আর ময়দা খাওয়া ছেড়ে দিল। যে পয়সাটা বাচল তাই দিয়ে পূর্ব-বাংলার দুস্থ চাষীদের সাহায্য করা হবে, এই রকম স্থির হল।

কবি ঠিক সেই সময়ে শান্তিনিকেতনে ছিলেন না, পরে যখন এইভাবে টাকা তোলার কথা শুনলেন, তখন তিনি আপত্তি জানিয়ে বলেছিলেন, এ ভাবে না তুলে পরিশ্রম করে তুললে ভালো ছিল। অযথা শরীরকে পীড়িত করে সৎকাজে নামতে হয় না, এ কথা কবি অনেকবার বলেছেন। দরকার হলে কষ্ট সইতে পারবে, শরীরকে এমন করে তৈরি করতে হবে। কিন্তু অকারণে শারীরিক যন্ত্রণা ডেকে আনার পক্ষপাতী ছিলেন না রবীন্দ্রনাথ। তার মতের মধ্যে একটা সহজ যুক্তি ছিল। শরীরকে যদি বেশি কষ্ট করতে হয়, মনটাও কেবলই সেই দিকে যায়। কি করে শরীরটা একটু আরাম পায় শুধু এই চিন্তা নিয়েই থাকে, কোনো কাজে তেমন উৎসাহ পায় না। সেইজন্য শরীরকে শক্ত করে তৈরি করলেও, যথাসম্ভব তাকে যন্ত্রণা থেকে রক্ষা করতে হয়, যাতে তার সমস্ত শক্তি সৎকাজে নিয়োজিত হতে পারে।

এই নিয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে কবির মতে মিলত না। আশ্রম দেখে গান্ধীজী বলেছিলেন, ছেলেরা এ ব্যবস্থায় বড় আরামপ্রিয় হয়ে যাবে, রান্নাঘরে ও অন্যান্য কোনো কাজের জন্যও চাকর রাখা ঠিক নয়। কবি কিন্তু তাতে মত দেন নি, যদিও একবার পরীক্ষা করে দেখেছিলেন। পরের বছর গান্ধীজী এসে তাঁর ছাত্রদের হরিদ্বারে নিয়ে গেলেন। আজ পর্যন্ত গান্ধীজীকে স্মরণ করে শান্তিনিকেতনের আশ্রমবাসীরা বছরে একদিন আশ্রমের হীনতম কাজও নিজেরা করেন।

এর মধ্যে 'ফাল্গুনী' নামে একটা নাটক লেখা হল, 'চতুরঙ্গ' বলে চারটি গল্প এক সঙ্গে প্রকাশিত হল, 'সবুজ পত্রে' 'ঘরে বাইরে' বলে একটা নতুন উপন্যাস বেরোতে লাগল। যে সব সমস্যা নিয়ে কবি নিভৃতে চিন্তা করতেন, সে সমস্ত গল্প হয়ে নাটক হয়ে প্রস্ফুটিত হত। 'চতুরঙ্গ', 'ঘরে বাইরে' সেই ধরনের গল্প। যে সব মন্দ নিয়ম সমাজে চলে আসছে বলে লোকেরা মেনে নিচ্ছে, কবি তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতেন এই সব গল্পের মধ্যে। 'ঘরে বাইরে' হল ঠিক সেই যুগের উপযুক্ত গল্প। আমাদের দেশের মেয়েরা তখন সবে মাত্র উচ্চ শিক্ষার আলো পেয়ে সমাজের কর্মক্ষেত্রে নামতে আরম্ভ করেছেন। আবার অন্যদিকে নিজেদের ঘর-সংসারের প্রতিও তাঁদের অনেক কর্তব্য আছে। এই সব সমস্যা নিয়ে গল্প।

রবীন্দ্রনাথ যে শুধু শান্তিনিকেতনের মধ্যেই নিজের শিক্ষার আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে আর বিদেশে সে বিষয় জানিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন, তা নয়। শান্তিনিকেতনের মধ্যে কতটুকুই বা ক্ষেত্র সে কথা জেনে, সারাজীবন তিনি নানান প্রবন্ধে শিক্ষা সম্বন্ধে নিজের চিন্তার ফলাফল প্রকাশ করেছেন। এই সময়ে লেখা 'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধে আবার সেই পুরনো কথাই, অর্থাৎ মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়া উচিত, এই কথাই বলেছেন। আরেকটি প্রবন্ধও এই সময় প্রকাশিত হয়েছিল, তার নাম 'ছাত্র-শাসন'। সেটা ছিল সাম্রাজ্যবাদীদের যুগ, বল প্রয়োগ করে ছাত্রদের তখন শাসন করা হত, তাদের আত্মসম্মানে আঘাত দেওয়া হত, কবি তার প্রবল প্রতিবাদ করেছিলেন। বলেছিলেন, এতে এদেশে ইংরেজ বিদ্বেষ বেড়েই যাবে। হয়েছিলও তাই।

এই ভেবে বারবার আশ্চর্য হতে হয় যে ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ বছর আগে কবি যে সমস্ত সমস্যার কথা উত্থাপন করেছেন আর তার সমাধানের যে সব উপায় উল্লেখ করেছেন—যেমন শিক্ষাক্ষেত্রে মাতৃভাষা ব্যবহার, পল্লীগ্রামের উন্নয়ন, কুটির শিল্প ও লোকশিক্ষার উন্নতিসাধন

ইত্যাদি, সেই সব সমস্যা নিয়ে আমাদের কর্তৃপক্ষেরা আজও মাথা ঘামাচ্ছেন, আর এতদিন পরেও কবির দেখানো সেই সব পুরনো পথগুলিকে খুলে দেবার কথা ভাবছেন। এই জন্যই লোকে বলে যে কবিদের দিব্যদৃষ্টি থাকে, তাঁরা ভবিষ্যৎ দেখতে পান। আসলে তাঁরা সংসারের বন্ধন মানেন না, স্বার্থের গণ্ডির বাইরে তাকিয়ে থাকেন বলেই আমাদের কাছে যা অন্ধকার, ওঁদের কাছে তা সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে। অসাধারণ মানুষ যাঁরা, তাঁরা অনেক সময়ই তাঁদের যারা বিপক্ষ দল বলে পরিচিত, তাদেরও শ্রদ্ধা লাভ করেন। রবীন্দ্রনাথ চিরকাল ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদের নিন্দা করে এসেছেন, কিন্তু ইংরেজদেব নানান গুণেব প্রতি তিনি সর্বদা শ্রদ্ধাও জানিয়েছেন। ইংরেজ সবকারও তাঁর অসাধাবণ গুণাবলীব প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে ১৯১৫ সালে, জুন মাসে, কবিকে 'স্যার' উপাধি দিয়ে ভূষিত করেন। এইভাবে প্রকাশ্যে আর এর চাইতে বড় সম্মান তাঁরা কি-ই বা দিতে পারতেন ?

১৯১৬ সালে কবি আবেকবার বিদেশে গেলেন, এবার পুবমুখী হয়ে, ব্রহ্মদেশে, চীনদেশে ও জাপানে। তবে সরকারী আদেশে হংকং থেকেই জাপান যাত্রা কবতে হল, অন্যান্য জায়গা আর দেখা হল না। জাপানে কবিব বলিষ্ঠ পৌরুষেব যে পরিচয় পাওয়া গেল, ভাবলে শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়।

তখন জাপানেও সাম্রাজ্যবাদেব যুগ চলছে, চীনে সবে গণতন্ত্র একটুখানি শুরু হয়েছে। জাপানবাসীরা কবিকে খুবই আদর দেখিয়েছিলেন, কিন্তু কবিদের চোখ হয় অন্য রকমের, সেইখানেই তিনি চীনদেশে জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের ব্যবহারের প্রতিবাদ করেন। তাতে ওখানকার কর্তৃপক্ষরা তাঁর উপব খুবই অসন্তুষ্ট হলেন, কিন্তু কবি যে কথাকে সত্য বলে উপলব্ধি করেছেন, তাকেই প্রকাশ করলেন। জাপান ঘুরে প্রশান্ত মহাসাগর পার হতে পারলেই

ক্যানাডা ও আমেরিকা। ক্যানাডা থেকে কবিকে নিমন্ত্রণ করে পাঠাল। কবি সে নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলেন, কারণ ক্যানাডা ভারতীয়দের প্রতি তখন ন্যায়বিচার করত না।

ক্যানাডায় না গিয়ে গেলেন আমেরিকাতে। সেখানে কয়েক মাস ধরে নানান জায়গায় ঘুরে ঘুরে বক্তৃতা দিয়ে বেড়ালেন. তার ফলে ভারতের একজন অসাধারণ কবির মুখে আমেরিকার জনসাধারণ ভারতের যে পরিচয় পেল তার প্রতিদানে তাকে যে শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি দিল, সে আর কাউকে দিয়ে সম্ভব হত না। শুধু ভারতের বাণী দিয়েই কবি থামেন নি, আমেরিকার ভারত-বিদ্বেষের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন।

এগারোবার কবি ভারতের মাটি ছেড়ে বিদেশে গেছেন, আর যেখানেই গেছেন, কেউ কেউ অসন্তুষ্ট হলেও সেখানকার বেশির ভাগ লোকেরাই ভারতের বন্ধু হয়ে উঠেছে। ব্যবসার জন্য যারা যায়, চাকরি করতে যারা যায়, বিদ্যালাভের আশায় যারা যায়, তাদের কাছে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ গুণের পরিচয় পাওয়া যায় না, কারণ তারা নিতে যায়, কিছু দিতে যায় না।

নবম অধ্যায়

প্রায় দশ মাস বিদেশ ভ্রমণের পর কবি দেশে ফিরে এলেন। প্রথম মহাযুদ্ধ তখনো চলছে, কিন্তু সে যুদ্ধ ভারতবর্ষকে প্রত্যক্ষভাবে সামান্যই আঘাত করেছিল। এসে দেখেন ইতিমধ্যে গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ আর রথীন্দ্রনাথ পাণ্ডা হয়ে জোড়াসাঁকোতে ভারতীয় শিল্পের এক বিদ্যালয় খুলে বসেছেন, তার নাম 'বিচিত্রা'। কবি ওই সঙ্গে একটা ক্লাব তৈরি করে ফেললেন, তারও নাম 'বিচিত্রা'। দেখতে দেখতে সেখানে কলকাতা শহরের যত জ্ঞানীগুণীরা নিয়মিত-ভাবে জড়ো হতে লাগলেন। সেই যে অনেকদিন আগে, কবির কৈশোরে ওই বাড়িতেই বিদ্বজ্জন-সমাগম সভা হত, এ যেন তারই এক ধাপ উপরে। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সভার প্রাণকেন্দ্র, কত যে নতুন লেখা এখানে পড়া হত তার ঠিক নেই। তবে কবি তো আর কলকাতায় থাকতেন না, আসতেন যেতেন।

এতদিন জোড়াসাঁকোর বাড়ির জাকজমক অনেকখানি চলে গেছে। তার চেহারাও অনেক পালটে গেছে। এখন যে দোতলা লাল বাড়িটা দেখা যায়, সেটি আগে ছিল না। এই বাড়ি রবীন্দ্রনাথই করিয়েছিলেন। ঠাকুর পরিবারেব অনেকেই ওই বাড়ির বাসিন্দা হলেও সব যেন ছাড়া ছাড়া হয়ে গিয়েছিল। কবির ভাইদের পবিবারও অনেক ক্ষেত্রেই এখানে ওখানে ছড়িয়ে পড়েছেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ সবার বড়। তিনি অনেক দিন শান্তিনিকেতনে বাস করে ১৯২৬ সালে মারা যান। তাঁর ছেলে দীপেন্দ্রনাথও সব সময় শান্তিনিকেতনেই থাকতেন। তাঁর ছেলে দীনেন্দ্রনাথও শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের কাছে দিনদা বলে পরিচিত ছিলেন। সে সময় তাঁর কাছে এক আধটা গান শেখে নি, এমন ছাত্র কম ছিল।

কবি গান রচনা করে, তাতে সুর দিয়ে, দিনেন্দ্রনাথকে সুরটি শিখিয়ে দিয়ে, নিশ্চিন্ত থাকতেন। দিন্‌দা ছিলেন গুরুদেবের সুরের ভাণ্ডারী।

তারপর সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন আই-সি-এস। চাকরির জন্য এদিকে ওদিকে ঘুরতে হত। পরে যদিও কলকাতাতেই বাস করতেন, জোড়াসাঁকোব সঙ্গে সম্পর্ক ছিল কম।

হেমেন্দ্রনাথ ১৮৮৪ সালেই মাবা যান, বীবেন্দ্রনাথ ১৯১৫ সালে। জ্যোতিবিন্দ্রনাথ বাঁচিতে ঋষিব জীবন যাপন কবতেন। পাহাড়েব উপর সুন্দব বাড়ি কবে, প্রকৃতিকে সঙ্গী কবে নিয়ে থাকতেন। তিনি মাবা যান ১৯২৫ সালে। সোমেন্দ্রনাথ ছিলেন কবিব এক বছবেব বড়, তাঁব ছোটবেলাকাব খেলাব সাথী, ১৯২৩ সালে মাবা যান। এঁকে জোডাসাঁকোতেই দেখা যেত।

মাঝে মাঝেই কবিও এসে থাকতেন। তখন সমস্ত বাড়ি যেন জেগে উঠত, সভা, নাটক, গান বাজনা চলত। আবাব শান্তিনিকেতনে ফিবে যেতেন কিংবা হয়তো বিদেশে যেতেন।

যেখানেই থাকুন কবি, তাঁকে ঘিবে থাকত যেন মধুব একটা ঐকতান। তাঁব হৃদযেব মধ্যে যেটাকে তিনি সত্য বলে উপলব্ধি কবেছিলেন, তাব প্রতি তাঁব অচল নিষ্ঠা ছিল। যা বিশ্বাস কবতেন না, এমন কথা কখনো লিখতেন না, পাঠকদেব চমক লাগাবাব জন্য কখনো কোনো কৃত্রিম উপায অবলম্বন কবতেন না। ববীন্দ্রনাথেব নাটক অভিনয় কবাব জন্য আলোব চাতুবী কিংবা স্টেজেব ঝকমকিব দবকাব হয় না। প্রত্যেকটি নাটক যেন একেকটি ধ্রুব আদর্শকে অবলম্বন কবে লেখা. তাবই মহিমায় নাটকও মহীয়ান। যেখানে সামাজিক গল্প কিংবা সামাজিক নাটক লিখেছেন, সেখানেও সমাজেব মানুষদেব কৃত্রিমতাকেই প্রকাশ কবে দিযেছেন। কোনো দলাদলিব মধ্যে কখনো যান নি, নিজেব কোনো ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য নিয়ে কলম হাতে ধবেন নি।

ভারি মধুর রসবোধ ছিল কবির, সেটা ছোটবেলা থেকেই নানান ভাবে প্রকাশ পেত। অল্প বয়সে একবার রাঁচি থেকে ভাইপো সুরেন্দ্রনাথকে কবিতায় একখানি চিঠি লিখেছিলেন। সে রকম রসে ভরা চিঠি আর কোনো কিশোর কাউকে কখনো লিখেছে বলে মনে হয় না।

কথাবার্তার নিচে নিচে সর্বদা যেন একটা রসের নদী বইত। চিঠিপত্রে ধরা পড়ে যেত, চোখে মুখে উচ্ছল হয়ে উঠত, ছোট বড় ভেদ রাখত না, এক মুহূর্তে সবাইকে অন্তরঙ্গ করে ফেলত। ছোট ছোট ঘটনার মধ্যে দিয়ে এই রসবোধটা ক্রমাগত প্রকাশ পেত। তাঁর এক ছাত্র রোজ লক্ষ্য করত, ক্লাসের মাঝখানে চাকর এসে গেলাস ভরে কিসের একটা শরবতের মতন জিনিস কবিকে দিয়ে যায়, আর তিনি সেটাকে নিঃশেষে খেয়ে ফেলেন। ভারি লোভ লাগত ছেলেটার। এত লোভ লাগত যে, দেখেই বোঝা যেত। একদিন কবি তাকে বললেন, কি রে, খাবি নাকি? চাকর এসে তাকেও এক গেলাস দিয়ে গেল, আর তাকে পায় কে! টেনে এক চুমুক দিয়ে দেখে শরবত তো নয়. চিরতার জল, বিষ তেতো! কিন্তু গেলাসের রসটা তেতো হলেও কবির রসিকতাটুকুর মিষ্টত্ব আজও ওই ছেলেটার মুখে লেগে রয়েছে।

এই সব কারণে যারা তাঁকে ঘিরে থাকত, তারা যেন তাঁর আপন জন হয়ে যেত। কি যে দয়ালু ছিলেন, ভাবা যায় না, কত লোকে তাঁর এই দয়ার সুবিধা নিয়ে নিজেদের স্বার্থটুকু গুছিয়ে নিত।

কিন্তু কবিরা যেখানে বাস করেন, সাধারণ-মানুষের চোখই সেখানে পৌঁছয় না, হাত দিয়ে বাঁধবার চেষ্টা করা তো দূরের কথা। রবীন্দ্রনাথকে কেউ কখনো বাঁধতে পারে নি; যেই কাছে এসেছে, তাঁর স্নেহের ভাগ পেয়েছে, আবার যখন চলে গেছে কোনো দাগ রেখে যায় নি।

যে সব মহানুভব মানুষরা নিজেদের জীবনের সমস্ত উচ্চাশা কবির কাছে উৎসর্গ করে দিয়ে শান্তিনিকেতনে এসে দিন কাটিয়েছিলেন, তাঁরা এ কথা জেনেই এসেছিলেন। তাদের নাম করে শেষ করা যায় না। কিন্তু চল্লিশ বছর ধরে যত ভাগ্যবান ছাত্র তাদের কাছে শিক্ষা নিয়েছে তারা চিরদিন কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তাদের কথা মনে করবে। কারণ গুরুদেব যে স্বপ্ন দেখতেন এঁরাই সেই স্বপ্নকে মূর্তি দিতে চেষ্টা করতেন। সেই প্রথম দিনের ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত সেই ব্রত তাঁরা পালন করতে চেষ্টা করছেন।

কোনো কাজই কখনো শেষ হয় না, পৃথিবীর মাটিতে একটা আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করার কাজ বড়ো শক্ত কথা। জীবনের শেষের দিকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন।

"শুধু আমার একান্ত মনের জোরে এই কাজ চলেছে, এনেছে কত পরিবর্তন, কত লোকের আশা ও ব্যর্থতা, কত সুহৃদের অভাবনীয় আত্মনিবেদন, কত অজানা লোকের অহেতুক শত্রুতা, কত মিথ্যা নিন্দা ও প্রশংসা, কত দুঃসাধ্য সমস্যা। এতকালের সাধনার বিফলতা প্রকাশ পায় বাইরে, এর সার্থকতার সম্পূর্ণ প্রমাণ থেকে যায় অলিখিত ইতিহাসের অদৃশ্য অক্ষরে।"

কোনো মহৎ কাজই সহজে হবার নয়। কবি সারাজীবন অক্লান্ত ভাবে তাঁর অন্তরের আদর্শের জন্য কাজ করে গেছেন। বাইরের লোকে সব সময় তার মূল্য বোঝেনি।

এদিকে দেশে তখন নানা অশান্তি। একবার যে কোনো দেশের দেশাত্মবোধ জাগে আর সেখানে শান্তি থাকে না, যতদিন না স্বদেশকে তার যোগ্য আসনে প্রতিষ্ঠা করা যায়। এই দেশাত্মবোধ জাগাবার কাজে কবির পিতামহ, পিতা, বড় ভাইরা ও কবি নিজে, নিজেদের নিবেদন করেছিলেন।

তাদের চেষ্টাতেই দেশী শিল্প, দেশী সাহিত্য, দেশী আচার ব্যবহার, দেশী উৎসব ও দেশী সংগীত, দেশী ভাষা খানিকটা মর্যাদা পেয়েছিল। বিদেশের চোখে ভারতবর্ষ খানিকটা সম্মানও পেয়েছিল। কিন্তু কবিকে আজীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছিল।

১৯১৭ সালে সবুজ পত্রে 'ভাষার কথা' নামে প্রবন্ধ লিখলেন, 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' লিখলেন, 'দেশ দেশ নন্দিত করি' মন্দ্রিত সংগীত রচনা করলেন। 'তোতা কাহিনী' নাম দিয়ে এখনকার শিক্ষা সম্বন্ধে সরকারের মতভাব বিষয় গল্প লিখলেন। রাষ্ট্রীয় আন্দোলন থেকে অবসর নিলেও দেশের মঙ্গল চিন্তা সর্বদাই তার মনের মধ্যে থাকত। যারাই দেশের জন্য একটুকু চিন্তা করতেন তাদের সঙ্গেই তার যোগাযোগ ছিল কখনো বন্ধু রূপে, কখনো প্রতিপক্ষ রূপে। কত লোকের সঙ্গে চেনাজানা ছিল কবির, দেশের নাড়ির উপর সর্বদা আঙুলটি টিপে রাখতেন, ক্ষীণতম সাড়াটিও যাতে ধরতে পারেন। অনেক আগে সিস্টার নিবেদিতা, ভারতের মাদাম এনি বেসান্ত, মতিলাল ঘোষ, চিত্তরঞ্জন দাশ, বিপিন পাল, ফজলুল হক, তিলক-মহারাজ, মালবীয়জী, এদের সঙ্গে নানান দিক থেকে পরিচিত তো ছিলেনই। তার উপর বিদেশ থেকে যারা নানান কাজের ভার নিয়ে এদেশে আসতেন, তাঁরা এদেশের প্রকৃত বন্ধু ছিলেন না বলে, কবি তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়ে চেষ্টা করতেন, তাদের হাতে দেশের যেন কোনো ক্ষতি না হয়।

১৯১৮ সালের নভেম্বর মাসে প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হল জার্মানির সম্পূর্ণ পরাজয় দিয়ে। কবির বয়স তখন সাতান্ন বছর। যুদ্ধ তো শেষ হল, এখন তার ফলাফল কি রকম দাঁড়াবে তাই দেখবার জন্য পৃথিবীর লোকেরা উদগ্রীব হয়ে রইল। বিশেষত ভারতবর্ষের নেতারা।

তার কারণ ছিল যথেষ্ট। যুদ্ধের সময় ইংল্যাণ্ড ও মিত্রপক্ষীয়রা

বলেছিলেন, যে জর্মানি অন্যান্য দুর্বল দেশকে গ্রাস করতে চায়, তাই তারা অস্ত্র ধরেছে। মিত্রপক্ষের যুদ্ধে যোগ দেবার উদ্দেশ্য হল ছোট আর দুর্বল দেশসমূহকে রক্ষা করা। ইংল্যাণ্ড এ রকম আশাও দিল যে, ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষকে নিজের দেশকে শাসন করতে শিখিয়ে তাকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে। এই আশাতেই বুক বেঁধে যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষ মিত্রপক্ষকে যথাসম্ভব সাহায্য করেছিল।

যুদ্ধের শেষে কিন্তু অন্যরকম ব্যাপার দেখা গেল। বিলেতে থাকতেন ভারত-সচিব মণ্টেগু সাহেব, যুদ্ধ বিরতির কয়েক মাস আগে তিনি একটা পরিকল্পনা তৈরি করে পাঠালেন, যার মধ্যে ভারতের শাসনরীতিতে অনেকটা নতুনত্ব এনে দেবার প্রস্তাব ছিল। কিন্তু সেটাতে স্বাধীনতার জন্য দেশটাকে তৈরি করা হবে, নাকি হিন্দু মুসলমানের মধ্যে অমিল ঘটাবার ব্যবস্থা হবে, তাই নিয়ে কথা উঠতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘদিন ধরে দেশের কিসে মঙ্গল হবে তাই ভেবেছেন। তার উপর এই যুদ্ধে দেশে দেশে বিরোধ হলে তার ফল যে কতখানি মর্মান্তিক হয়, তাও দেখেছেন। পৃথিবীর প্রায় সব দেশে গিয়ে, সেখানকার লোকদের নিজের চোখে দেখে এসেছেন। তাদের নিজেদের মুখে তাদের কথা শুনেছেন, ভারতের কথা তাদের জানিয়েছেন। কত গভীর বন্ধুত্বের ভিত গেঁথে এসেছেন। ক্রমে তাঁর মনের মধ্যে এই ধারণা দৃঢ় হয়ে উঠল যে, কোনো ঝগড়াঝাটি বা কাগজপত্রে সই করা চুক্তি দিয়ে পৃথিবীতে শান্তি ও মঙ্গল প্রতিষ্ঠিত হবে না। একমাত্র উপায় হল পরস্পরকে চেনা জানা, পরস্পরের সঙ্গে জ্ঞান—বিদ্যা আদান প্রদান, পরস্পরকে ভালবাসা।

তাই যদি হয়, তাহলে পরস্পরের মনকে জানবার জন্য পরস্পরের সঙ্গে একটা প্রশান্ত পরিবেশে মেলমেশা করা চাই। পরস্পরের

জ্ঞানভাণ্ডার থেকে পড়াশুনো করা চাই। শান্তিনিকেতন ছাড়া এ আর কোথায় হওয়া সম্ভব? এই উদ্দেশ্য নিয়েই ১৯১৮ সালের ২৩শে ডিসেম্বর, পৌষ উৎসবের সময় বিশ্বভারতীর ভিত্তি স্থাপন করা হল।

সেই কত বছর আগে স্কুল পালিয়ে, নির্জন দুপুরে বাংলা সাহিত্যের সমুদ্রের তলা হাতড়িয়ে, আকাশের গভীর নীলে পাখি ওড়া দেখে, কুস্তি করে, ঘোড়ায় চড়ে, মুগুর ভেঁজে, গান বাজনায়, থিয়েটারে যাত্রায় ঘোরাঘুরি করে, একদিন যে ছোট বীজটি কবির মানসলোকে শিকড় নামিয়েছিল এখন সে ডালপালা মেলে পাতায় কুঁড়িতে ফুলেতে ফলেতে অপরূপ হয়ে উঠতে লাগল।

দশম অধ্যায়

ববীন্দ্রনাথেব জীবনেব এ সময়টি কিন্তু নিববচ্ছিন্ন সুখেব ছিল না। ১৯১৮ সালেব মে মাসে তাঁব বড় মেয়ে বেলা দেবী মাবা গেলেন। ডিসেম্বব মাসে প্রিয় সহকর্মী অজিতকুমাব চক্রবর্তী মাবা গেলেন।

একটানা অনেকটা সময় কবি এবাব শান্তিনিকেতনে বইলেন পডাশুনো ও অধ্যাপনা নিয়ে। তাবপব একবাব দক্ষিণ ভাবত ঘুবে এলেন, নানান জায়গায় বক্তৃতাও দিলেন। বেশি দিন এক জায়গায় থাকা যেন তাঁব সইত না। ঘুবে বেডান, বক্তৃতা দেন, তাব মধ্যে নানান দেশেব সাহিত্য পডেন, দেশ দেখেন, লোক চেনেন।

মনেব মধ্যে চিবদিন বিদেশী জ্ঞানে সমৃদ্ধ সমগ্র একটি পবিপূর্ণ দেশীয় বিদ্যাব রূপেব স্বপ্ন দেখে এসেছেন। যেখানেই গোঁডামী দেখেছেন প্রতিবাদ কবেছেন, আবাব যেখানে বিদেশেব অনুকবণ দেখেছেন সেখানেও প্রতিবাদ কবেছেন। এবাব মহীশূব বিশ্ব-বিদ্যালয়েব বিদেশী ভাব দেখে মনে বড পীডা বোধ কবেছিলেন। তবু আনন্দও পেয়েছিলেন প্রচুব, আদবও পেয়েছিলেন, দেশেব সংস্কৃতিব অনেক দৃষ্টান্তও দেখেছিলেন। সত্যি কথা বলতে কি দক্ষিণ ভাবতে সাহেবিয়ানা কমই দেখা যায়।

ওদেব একটা বিরুদ্ধ দলও ছিল। কবি চিবদিনই গোঁডামিব শত্রু, এখানকাব ব্রাহ্মণবা বড গোঁডা, জাত মানাটা বডই সংকীর্ণ। কবি আবাব এব আগেই জাত ভেঙে বিবাহ সমর্থন কবে এসেছেন, তাই অনেকে তাঁব উপব অসন্তুষ্টও হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁব মতামত পবিষ্কাব কবে লিখে খববেব কাগজে ছেপে দিয়েছিলেন। কাকেও কখনো ভয় কবেন নি।

৬ মাস ঘুবে ঘুবে শেষে শবীবটা অসুস্থ হয়ে পড়াতে বাডি

ফিরে এলেন। মনের মধ্যে সব সময় বিশ্বভারতীর চিন্তা ঘোরে। কলকাতায় এসে এম্পায়ার থিয়েটারে বিশ্বভারতীর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটা বক্তৃতা দিলেন। নিজের দেশে এই প্রথম কবি ইংরেজিতে বক্তৃতা দিলেন। যাঁরা বক্তৃতা শুনতে এলেন তাঁদের আবার টিকিট কিনে বক্তৃতা শুনতে হয়েছিল।

শুধু কাজের মধ্যে দিয়ে সব সময় সব কথা প্রকাশ করা সম্ভব হয় না, তাই কবিকে মাঝে মাঝেই নিজের মতামতগুলোকে প্রবন্ধের আকারে প্রকাশ করতে হত। এর উদ্দেশ্য ছিল সব কথা দেশের লোককে জানানো। নিজের উপর তাঁর গভীর বিশ্বাস ছিল, নিজেকে সমর্থন করবার জন্য এ সব প্রবন্ধ লিখতেন না।

এবার বসু বিজ্ঞান মন্দিরে বিশ্বভারতীর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলেছিলেন যে যেখানে শুধু হাত পেতে বিদ্যা নিতে হয়, সেখানে আমরা ভিখারীর সমান। যেখানে প্রতিদানে কিছু দিতে পারি, সেখানে আমাদের নিজেদের মর্যাদাও বজায় থাকে। বিশ্বভারতীতে তারই ব্যবস্থা হচ্ছে।

আরও বলেছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম কাজ হল বিদ্যা উদ্ভাবন করা, দ্বিতীয় কাজ বিদ্যা দান করা। তার মানে শুধু পুরনো বিদ্যা বিলোলেই হবে না, নতুন জ্ঞান আবিষ্কার করা দরকার। তারপর বিদ্যাটাকে হতে হবে আমাদের জীবনযাত্রার একটা অঙ্গ, তাকে আলাদা করে-রাখা একটা বিদেশী পোশাকের মত মনে করলে চলবে না।

এই সব উদ্দেশ্য চোখের সামনে রেখে বিশ্বভারতীর শিক্ষার পরিকল্পনা তৈরি হল। দেশী বিদেশী জ্ঞানদানের ব্যবস্থা রইল, আবার গান বাজনা, শিল্প, গো-পালন, কৃষিবিদ্যা, বয়নবোনা এসবের কথাও মনে রাখা হল।

এমনি করে কাজে কর্মে দিন যাচ্ছিল। লেখাতে যেন একটু ছেদ

পড়েছে মনে হত, যদিও লেখা একেবারে বন্ধ হয়ে যায় নি। এমন সময় কুখ্যাত জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড সমস্ত ভারতবর্ষকে স্তম্ভিত ও ভারতের কবি রবীন্দ্রনাথকে মর্মাহত ব্যাকুল করে তুলল।

ব্যাপারটাকে একটু আগে থেকে বলতে হয়। মহাযুদ্ধের পর থেকে সকলে শান্তির আশায় পথ চেয়েছিল, আর ভারতবর্ষ কতখানি নিরাশ হয়েছিল সে কথা তো আগেই বলা হয়েছে। স্বাধীনতা যে কেউ উপহারের মত নিয়ে এসে কোলে ফেলে দেবে না, তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে, এই কথা মনে করে বিপ্লববাদীরা আন্দোলন শুরু করলেন। গান্ধীজী এগিয়ে এলেন।

গান্ধীজীও কবির মত শান্তিতে বিশ্বাস করতেন, অহিংসার বাণী বলতেন। রবীন্দ্রনাথ এই সময় এক জায়গায় লিখেছিলেন, 'আমাদের জন্য একটা বড় পথ আছে, সে হচ্ছে দুঃখের উপরে যাবার পথ। যারা মারে তাদের চেয়ে আমরা যখন বড় হতে পারব তখন আমাদের মার খাওয়া ধন্য হবে। সেই বড় হবার পথ না-লড়াই করা, না-দরখাস্ত লেখা' –গান্ধীজীও এই কথা ভেবেই সত্যাগ্রহের মন্ত্র দিয়েছিলেন।

বিপ্লববাদীরা অতটা সংযত ও শান্তিপ্রিয় ছিলেন না, দেশের নানান জায়গায় তখন আন্দোলন চলছিল। আন্দোলন বন্ধ করবার জন্য দেশবাসীর উপরে অত্যাচার হচ্ছে। তার প্রত্যুত্তরে আরও আন্দোলন। দেশের লোক ক্ষেপে উঠেছে।

ইংরেজ সরকার উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন, বিপ্লববাদীদের দমন করবার জন্য রৌলট অ্যাক্ট নামে নতুন আইন করলেন। তাতে দেশবাসীদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার ও জন্মগত স্বাভাবিক স্বাধীনতাতে হস্তক্ষেপ করা হয়েছিল।

গান্ধীজী তো প্রতিবাদ করবেনই। তার পরামর্শ মত নিরুপদ্রব প্রতিরোধ পন্থা অবলম্বন করা স্থির হল। দেশ জুড়ে একটা প্রতিবাদ

উঠল। আন্দোলনও বেড়ে গেল। শেষ অবধি পাঞ্জাবে সামবিক শাসনের ব্যবস্থা হল। প্রায়ই ভারতবাসীদের সঙ্গে পুলিশের ও শাসনকর্তাদের মারামারির কথা শোনা যেতে লাগল অথচ কাগজে সঠিক খবর ছাপানো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এণ্ড্রুজ সাহেব ও গান্ধীজীকে দিল্লী যেতেই দেওয়া হল না, ফলে পাঞ্জাবে কবে কি হচ্ছে বাকি দেশটা সময় মত তার খবর পায় না।

প্রতি বছর বৈশাখী পূর্ণিমাতে হাজার হাজার লোক জালিয়ান-ওয়ালাবাগ উদ্যানে জড়ো হতেন। এ বছরও তাই হলেন, পুলিশ বারণ করল না। কিন্তু শহরের মিলিটারি শাসক জেনারেল ডায়ার, নব্বইজন সৈনিক নিয়ে, নিরস্ত্র অসহায় জনতার উপর গুলি চালালেন। তার ফলে তিনশো উনআশীজন মারা গেলেন, আর কতজন যে আহত হলেন, তার ঠিক নেই।

খবরটা চেপে রাখবার চেষ্টা হল কিন্তু কেমন করে জানি কয়েক দিনের মধ্যে দেশময় ছড়িয়ে পড়ল দুঃখে, অপমানে দেশের লোকের বাক্‌রোধ হবার যোগাড়। ভাষা এল ভারতের কবি রবীন্দ্রনাথের মুখে। তিনি তাঁর 'স্যার' উপাধি ঘৃণার সঙ্গে ফিরিয়ে দিলেন, সেই সঙ্গে বড়লাট লর্ড চেমসফোর্ডকে একখানি অবিস্মরণীয় চিঠিতে অত্যাচারী শাসনকর্তার হাত থেকে সম্মান গ্রহণ করাও যে ভারত-বাসীর পক্ষে অসম্মান, এই কথা লিখে ধিক্কার জানিয়েছিলেন। সমস্ত দেশের লোক ধন্য ধন্য করেছিল আর ইংরেজ সরকার ভারি ক্ষুব্ধ হয়েছিল।

কবি শান্তিনিকেতনে ফিরে এসে কাজে মন দিলেন। সেখানকার কাজের প্রসার যেমন বেড়েছে, দায়িত্বও বেড়েছে। কবি দেশের প্রাচীন ধর্মকে যেমন শ্রদ্ধা করেন, আধুনিক শিক্ষার আলোকেও তার চাইতে কম করেন না। শান্তিনিকেতনে একটি ছোট ছাপাখানা হল, বিজলবাতির ব্যবস্থা হল। ছোট আশ্রমের, মুষ্টিমেয় বাসিন্দার

জন্য সেই যথেষ্ট। অধ্যাপকদের সপরিবারে বাস করার জন্য 'গুরুপল্লী' নাম দিয়ে এক সারি খড়ের চালের কুটির তৈরি হল।

রবীন্দ্রনাথের মনে এই সময় কেমন একটা শূন্যতার পর্ব এসেছিল, শূন্যতা এই দিক দিয়ে যে নতুন ধরনের কিছু লিখলেন না। ক বছর ধরে পুরনো কথা নিয়ে নাড়াচাড়া করলেন, 'রাজা' নাটক ভেঙে 'অরূপ রতন' লিখলেন, পুরনো ভাব নিয়ে কবিত্বপূর্ণ ভাষায় 'কথিকা' লিখলেন, পরে যাকে 'লিপিকা' নামে সবাই জানে। এরই ভাষা থেকে পরে কবি গদ্যছন্দে কবিতা লেখার প্রেরণা পান। আর লিখলেন শত শত গান, তাছাড়া ছেলেদের পড়বার জন্য অনেক বই।

বিষয় আশয়ও খানিকটা না দেখলে চলে না। কবির প্রতিভা এতই বলিষ্ঠ যে, তার মধ্যে একটা প্রচণ্ড কাযকারী দিক মাঝে মাঝে সকলকে অবাক করে দিত।

মহর্ষি মারা যাবার সময় জমিদারি দেখাশোনার যে ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন, তাতে করে জমিদারির ভার পড়েছিল, দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের উপর, বাকিরা পেতেন মাসহারা।

দ্বিজেন্দ্রনাথ তার দায়িত্বটুকু অপর দুজনকে দিয়ে দিলেন। কাজেই জমিদারি দেখাশুনো করতেন রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথের ছেলে সুরেন্দ্রনাথ। এঁদের মধ্যে কবিরই ছিল দূরদৃষ্টি ও তীক্ষ্ণ বিষয়-বুদ্ধি; সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন বিদ্বান কিন্তু বড় খেয়ালী। কবি ক্রমশঃ লক্ষ্য করতে লাগলেন যে সুরেন্দ্রনাথ জমিদারির ততটা ধার ধারেন না, কিন্তু টাকা দিয়ে ব্যবসা করার শখ আছে, সরকার বাজারে টাকা খেলান। তাই দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে কবি শেষ পর্যন্ত জমিদারি ভাগাভাগি করে নিয়েছিলেন। পরে দেখা গেল যা আশঙ্কা করেছিলেন, ঠিক তাই হল। সুরেন্দ্রনাথের অংশের কিছুই আর বাকি থাকল না। কেউ কেউ রবীন্দ্রনাথের এই তীক্ষ্ণ বিষয় বুদ্ধির নিন্দা করতেন। তাঁরা বলতেন, সত্যিকারের কবিরা পার্থিব বিষয়ের ধার ধারেন না।

এ কথার কোনোই মূল্য নেই, কারণ যার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, সে কবি হোক বা যাই হোক, সেই বুদ্ধির আলোতেই সে জগৎ সংসারকে দেখবে। বোকামি কখনো প্রশংসনীয় হতে পারে না।

এইসব নানান সাংসারিক চিন্তা কবির জীবনে এসে ভিড় করত, কিন্তু তার প্রবল প্রতিভা কখনো কোনো বাধা মানে নি।

ওদিকে বিশ্বভারতীর কাজ শুরু হয়ে গেছে, ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার জন্য বিদ্যাভবন খোলা হয়েছে, পরে সেখানে তিব্বতী ও চীনা ভাষা শেখারও ব্যবস্থা হল। পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী এই বিভাগের ভার নিলেন।

পুজোর ছুটিতে কবি গেলেন আসামে হাওয়া বদল করতে। ফিরে এসে মণিপুরী নাচ শেখানোর ব্যবস্থা করলেন। আসামী মহিলাদের ঘরে বসে তাঁতে মুগা ও রেশম বোনা দেখে কবি খুশি হয়ে শান্তিনিকেতনেও যাতে ওই রকম হয় তার চেষ্টা করলেন। দুঃখের বিষয় কিছু দিন পরে সেটা বন্ধ হয়ে গেল।

গান্ধীজী এই সময় নিমন্ত্রণ করে কবিকে গুজরাটে নিয়ে গেলেন। সবরমতী আশ্রমে কবি একদিন থেকে এলেন। তারপর ওদিকে নানান জায়গায় ঘুরে ১৯২০ সালের মে মাসে কলকাতায় এলেন।

এই যে ক্রমাগত ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন, এর অনেকগুলি কারণ ছিল। একে তো ছিল অন্তরের তাগিদ। বেছে বেছে বাউলদের দেশে আশ্রম ফেঁদেছেন, সেখানকার হাওয়াতেও যেন কী একটা ছিল। লোকে বলত ওই শুকনো লাল মাটির দেশে যারা থাকে, তাদের ভব-ঘুরে হয়ে বাউলদের মত গান গেয়ে বেড়াতে ইচ্ছে করে। কবির বেলায় কতকটা তাই হয়েছিল মনে হয়।

তাছাড়া আরেকটা কারণও ছিল। আশ্রমের চিরকাল টাকা পয়সার অভাব। এই অভাব মেটাবার ভার কবি নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। মাঝে মাঝে তাঁর দেখা পেলে দেশের লোকে তাঁর

আশ্রমের কথা জানতে পারবে, হয়তো ছাত্র পাঠাবে, সহযোগিতা করবে, আর্থিক সাহায্য পাওয়া যাবে। এবার যেমন লিম্বডির রাজা দশহাজার টাকা দান করলেন। নিজের জন্য কিছুই চাইতেন না রবীন্দ্রনাথ। এত কাজের মধ্যেও নিজের চিঠিপত্র ইত্যাদি নিজেই লিখতেন। কেউ চিঠি লিখলে তার উত্তর না দেওয়াকে তিনি সৌজন্যের অভাব মনে করতেন, ফলে কাজ বেড়ে যেত, সময় কুলিয়ে ওঠা দায় মনে হত। তবুও বহুদিন পর্যন্ত অর্থাভাবের জন্য চিঠিপত্র ইত্যাদির ভার নেবার লোক রাখতে পারেন নি।

সে বছর পুত্র ও পুত্রবধূর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আরেকবার বিলেত গেলেন। ইংল্যাণ্ডে পৌঁছে শিল্পী রথেনস্টাইন, নিকোলাস রোরিক, সাহিত্যিক বার্ণার্ড শ ইত্যাদির সঙ্গে দেখা হল। পিয়ার্সনের সঙ্গেও তিন বছর ছাড়াছাড়ির পর আবার দেখা হল। আগা খাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল জাহাজেই। বিখ্যাত সামরিক নেতা কর্নেল লরেন্সের সঙ্গে দেখা হল, অভিনেত্রী সিবিল থর্নডাইক, কবি লরেন্স বিনিয়ন, ইত্যাদি বিলেতের বাছাবাছা গুণীদের সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য লাভ করলেন।

এ বিষয় রবীন্দ্রনাথের কপালটা ছিল ভালো। তার জীবনকালে পৃথিবীতে যাঁরা শ্রেষ্ঠ মানুষ বলে স্বীকৃত হয়েছিলেন, তাঁদের প্রায় সকলের সঙ্গে তার চেনাজানা হয়েছিল। তা ছাড়া এমন বহুজনার সঙ্গেও আলাপ হয়েছিল, পরে যারা নানা ক্ষেত্রে বিখ্যাত হয়েছিলেন।

ইংল্যাণ্ড থেকে কবি ফ্রান্সে গেলেন, সেখানেও কত জ্ঞানীগুণীর সঙ্গে পরিচয় হল —সুপণ্ডিত সিলভাঁ লেভি, যিনি পরে এদেশে এসে কাজ করেছিলেন, কবি কটেস মোয়াই ইত্যাদি। ফ্রান্স থেকে হল্যাণ্ডে তারপর বেলজিয়াম, আবার ফ্রান্স।

কবির বড় ইচ্ছা আমেরিকা যাবার, কিন্তু সেখানে খানিকটা আগ্রহের অভাব দেখা গেল, এমন স্পষ্ট বক্তা কবির উপর যে

অনেকেই অসন্তুষ্ট হবেন সে তো জানা কথা। গেলেন তবু আমেরিকা, সঙ্গে পিয়ার্সন সাহেব। আমেবিকাতে নানান জায়গায বক্তৃতা দিলেও বিশ্বভারতীব জন্য টাকা তোলা হল না। তাব কারণ কবি ইংল্যাণ্ডেব সাম্রাজ্যবাদেব নিন্দা কবে থাকেন, তাব থেকে তাঁদেব কাবো কাবো ধাবণা হযেছিল যে জর্মানিব প্রতি তাঁব নিশ্চয খুব সহানুভূতি আছে। এঁবা দলে ভাবি, এঁদেব ক্ষমতাও ছিল, কাজেই আমেবিকাতে ভাবতেব প্রতি সহানুভূতিব এবাব অভাব দেখা গেল। কবি কিন্তু তাদেব খুশি কববাব জন্য নিজেকে ছোট কবলেন না। আবাব ফ্রান্সে ফিবে এলেন, বিখ্যাত লেখক বেঁাম্যা বোলাব সঙ্গে আলাপ হল। প্যাবিসেব একজন ধনী ভাবতীয মুক্তাব ব্যবসাযী বিশ্বভাবতীকে তাব চমৎকাব পুস্তক-সংগ্রহ দান কবলেন। ববীন্দ্রনাথ যুবোপেব নানান জাযগায ঘুবে বক্তৃতা দিলেন, স্ট্রাসবুর্গ, জুবিখ বিশ্ববিদ্যালযে, হামবুর্গ বিশ্ববিদ্যালযে, কোপেনহাগেন বিশ্ববিদ্যালযে, সুইডেনেব প্রাচীন উপশালা বিশ্ববিদ্যালযে ভিযেনাতে, প্রাহাতে। এইভাবে ন দশ মাস বিদেশে ঘুবে ঘুবে সব জাযগায ভাবতেব শান্তির ও সাম্যেব বাণী পৌঁছে দিযে, ১৯২১ সালেব জুলাই মাসে দেশে ফিবে এলেন।

একাদশ অধ্যায়

দেশে ফিরে এসে দেখেন গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন চলেছে, তার মূলমন্ত্র হল ইংরেজ শাসন-কর্তাদের সঙ্গে কোনো রকম সহযোগিতা করা হবে না। এই অসহযোগ আন্দোলনের মেলা ডালপালা দেখা দিয়েছে ততদিনে। গান্ধীজী এর মধ্যে একবার শান্তিনিকেতন ঘুরে গেছেন। তাঁর কাছ থেকে অনুপ্রেরণা পেয়ে শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের কর্মকর্তারা স্থির করেছেন আর ছাত্রদের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিতে পাঠানো হবে না। কলকাতার কলেজ ছেড়ে দিয়ে একদল যুবক স্কুলে গিয়ে গ্রামোন্নয়নের কাজ শুরু করে দিয়েছে। এই ধরনের কাজই ভালো তাদের মতে।

কবি বিদেশেও অসহযোগ আন্দোলনের কথা শুনে এসেছেন, এ বিষয় চিন্তা করবারও অনেক সময় পেয়েছেন। কোনোদিনও কবি ভয়ে বা লজ্জায় বা লাভের আশায়, বা বন্ধুত্বের খাতিরে, নিজে যেটাকে সত্য বলে জেনেছেন তাকে খর্ব করেন নি। এবারও করলেন না। অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিলেন না। এর মধ্যে যে বিদ্বেষের বীজ লুকিয়ে আছে তাই থেকে যে কি নিদারুণ অশান্তির ও উচ্ছৃঙ্খলতার সৃষ্টি হবে, বারবার সেই বিষয়ে দেশবাসীদের সাবধান করে দিলেন।

শিক্ষার ক্ষেত্রে এই অসহযোগ আন্দোলন যে কতখানি ক্ষতিকর হতে পারে সে কথা সবলোকে মনে করিয়ে দিলেন। এর থেকে যে কবির জীবনের ব্রত দেশে দেশে যাতে মিলন হয়, পৃথিবী জুড়ে যাতে মানবের প্রতিষ্ঠা করা হয়, তাকে অস্বীকার করা হবে। বন্ধুরা অনেকে অসন্তুষ্ট হলেন। গান্ধীজী নিজে এসব ব্যক্তিগত মতভেদের উপরে থাকতেন, তিনি কবির এই সততা দেখে তাঁর

নাম দিলেন 'মহা-প্রতিহারী'। এই নিয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর প্রীতির বন্ধন ভেঙে যায় নি। এর পরে গান্ধীজী জোড়াসাঁকোতে এসে কবি আর এণ্ড্রুজ সাহেবের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে দেশের অবস্থা নিয়ে পরামর্শ করেছিলেন।

শান্তিনিকেতনের কাজে কবি আবার ডুবে গেলেন। পাঁচ বছর পরে পিয়ার্সন সাহেব আবার ফিরে এসেছেন। এল্মহার্স্ট নামে একজন ধনী ইংরেজ বন্ধু এসেছেন। ইনি খালি হাতেও আসেন নি, তাঁর ভাবী স্ত্রীর কাছ থেকে বাৎসরিক পঞ্চাশ হাজার টাকা দানের ব্যবস্থা করে এসেছেন। অধ্যাপক সিলভাঁ লেভিও এসেছেন শিক্ষকতা করতে।

দু বছর আগে বিশ্বভারতীর ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিল। পরিকল্পনা হয়েছিল, কিছু কাজও আরম্ভ হয়েছিল। এবার নিয়মাবলী তৈরি করে, প্রকাশ্য সভায় উদ্বোধন হল। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ হলেন যুগ্ম সচিব। কবি নিজে একান্তরে দান করলেন তাঁর শান্তিনিকেতনের বাড়িঘর, পুস্তকাগার, জমিজমা, বাংলা বইয়ের স্বত্ব আর অনেক টাকা।

কবির এখন বাষট্টি বছর বয়স হয়েছে। বাড়ি আনাল হয়েছে, নতুন লেখাও হয়েছে কিছু কিছু, যেমন 'মুক্তধারা' নাটক। তা ছাড়া শান্তিনিকেতন থেকে কিছুদূরে শ্রীনিকেতনে বিশ্বভারতীর গ্রামোন্নয়নের কেন্দ্র খোলা হয়েছে। অনেকে বলেন, এই হল বিশ্বভারতীর আসল কাজ। দেশের জাতীয় জীবনকে যদি নতুন করে গড়ে তুলতে হয়, তা হলে এখানেই তা সম্ভব, শান্তিনিকেতনে ততটা নয়। সেখানকার ব্যাপার অনেকটা শৌখীন, পড়াশুনো, গান বাজনা, ছবি আঁকা ইত্যাদি। শ্রীনিকেতনে গেলে দেশের মাটির উপর পা নামিয়ে রাখতে হয়, না হলে দেশের আসল সেবা করা হয় না।

১৯২২ সালের মার্চ মাসে ইংরেজ শাসনকর্তারা গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করে ছয় বছরের কারাদণ্ড দিলেন। কবির সে কি দুঃখ। 'মুক্তধারা' অভিনয় করাবার ব্যবস্থা করছিলেন, সব বন্ধ করে দিলেন।

তারপরে আবার এল একটা ঘুরে বেড়াবার পালা। এবার দেশের মধ্যেই নানান জায়গায় বক্তৃতা দিয়ে বেড়ালেন। এখন লোকে তাঁকে খানিকটা বুঝতে শিখেছে। দেশেও যেমন, বিদেশেও তেমন, মানুষের মনে যেন কবি একটুখানি রঙ দিতে পেরেছেন। আর তাঁর শান্তির মন্ত্র নিয়ে লোকে তেমন বিদ্রূপ করে না। এই যে শান্তির একমাত্র পথ সে কথা অনেকে মেনে নিয়েছে। বিদেশেও তাঁকে শান্তির দূত নামে লোকে জানে। ভিন্নকে নিয়ে এসে এক করার মন্ত্র শেখার জন্য দেশ বিদেশ থেকে লোকে শান্তিনিকেতনে আসে, চিঠিপত্র লেখে। যুদ্ধক্ষত মৃতপ্রায় পৃথিবীতে যেন একটু একটু প্রাণের সঞ্চার দেখা যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তো আসলে রাষ্ট্রীয় দূত, বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যের দূত নন, তিনি মর্মে মর্মে কবি। পার্থিব কাজ কর্ম যাই করুন না কেন, অন্তর থেকে যে মুহূর্তে তাগাদা আসে, অমনি কণ্ঠ গান গেয়ে ওঠে।

দেশে এমন নিদারুণ অশান্তির সময় যাচ্ছে, তার মধ্যে ওই বছরই প্রথম বর্ষামঙ্গল উৎসবের অনুষ্ঠান হল। অনেকে কবির এই খেয়ালের সঙ্গে সহানুভূতি দেখাতে পারলেন না। এই দুঃখের দিনে গান বাজনার উৎসব করতে কি করে যে কবির মন চাইল, অনেক অন্তরঙ্গ আত্মীয় বন্ধুরাও বুঝলেন না। কবিদের যে অন্তর্লোকে বাস, সেখানে এঁদের কারো পদার্পণ করার ক্ষমতা নেই, কি করেই বা বুঝবেন? এ সব উৎসব অনুষ্ঠান দিয়েই যে রবীন্দ্রনাথ মাতৃ-ভূমির আরাধনা করতেন, তাই বা কে বুঝত?

রবীন্দ্রনাথ সংসারের সমস্ত কর্তব্য পালন করে যেতেন, কিন্তু

নিজে জানতেন ওসব তাঁর আসল কাজ নয়, এমন কি একথাও বলেছেন—এ আমার কাজ নয়, এ হল আমার কাজ-কাজ খেলা। তবে খেলাই হোক আর যাই হোক, সে কাজ তার ষোলো আনা পাওনার জায়গায় আঠারো আনাই আদায় করে নিত।

আশ্রমের কথাই ধরা যাক না। কেমন করে কবির দিন কাটত সেখানে? সকালে উঠে পড়ানো, দুপুরে খানিকটা লেখাপড়া, তারপর আবার পড়ানো, বিকেলে মেলা অতিথি অভ্যাগতদের আগমন হত; প্রায়ই এটা ওটা পড়ে শোনাতেন, নিজের লেখা থেকে কিংবা বিশ্বসাহিত্য থেকে, তারপর ছেলেদের ঘরে গিয়ে তাদের খেলায় যোগ দিতেন। তারপর সবাই চলে গেলে গভীর রাত পর্যন্ত আবার লেখাপড়া।

এর মধ্যে আবার আশ্রমের কারো অসুখবিসুখ হলে তাকে গিয়ে দেখে আসতেন। মাঝে মাঝে নিজে ওষুধ দিতেন, বায়ো-কেমিষ্ট্রি পড়ে অনেক সময় নাকি ভালো ওষুধই দিতেন। কিন্তু এ সবেতে শরীরটা বড় ক্লান্ত হয়ে উঠত। এই সময় একজনাকে একটা চিঠিতে লিখেছিলেন, 'এবার দেশে এসে অবধি আমার শান্তি নেই, বিরাম নেই। আজকাল তাই কেবলি ইচ্ছা করে চারদিকের বেড়া সমস্ত ভেঙে চুরে ফেলে সেই আমার অল্প-বয়সের সাহিত্যের খেলাঘরে পালিয়ে যাই।'

রাতে এরকম লিখতেন, আবার পরদিন ভোরে উঠে ছাত্রদের নিয়ে জামগাছের তলায় হয়তো বসে যেতেন। আসলে যাদের মধ্যে প্রতিভা থাকে তারা শান্তি পায় না কখনো, তাদের প্রতিভাই তাদের চিরদিন তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। তারা সবদা এমন একটা নিখুঁৎ জগতের স্বপ্নে বিভোর থাকে যে, এই মাটির পৃথিবীর এক কোণে তিষ্ঠুনো তাদের পক্ষে অসম্ভব। তাদের হাতে পায়ে চোখে মনে হৃদয়ে নিরন্তর একটা যাযাবর পাখি যেন ডানা ঝাপটায়।

এক জায়গায় বসে থাকা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। এক বাড়িতে পর্যন্ত বেশিদিন থাকতে পারতেন না। ঘর বদলাতেন, ঘরের আসবাব পালটাতেন। ছোটবেলা যে জোড়াসাঁকোতে জন্মেছিলেন ও মানুষ হয়েছিলেন, সর্বদাই তাকে ছেড়ে যেতে ব্যস্ত থাকতেন।

তাই বলে শিলাইদাতেও টিকতে পারেন নি। শান্তিনিকেতনে বাসা বাঁধলেন, কিন্তু নিজেই বলতেন যে সেখানেও থেকে থেকে প্রাণ অস্থির হয়ে উঠত, তখন আর সমুদ্র পাড়ি না দিয়ে উপায় থাকত না।

আবার বিদেশে গিয়েই দেশে ফেরবার জন্য হৃদয় ব্যাকুল হয়ে উঠত। চিঠিপত্র পড়ে বোঝা যেত যে, আশ্রমের ছবিটি তার সমস্ত ছোটখাটো খুঁটিনাটি নিয়ে সদাই তাঁর চোখের সামনে জেগে থাকত। সেখানকার প্রিয়জনদের চিঠি লিখতেন, ওই লতাগাছটার নিচে বাঁশের ঝাঁঝরি করে দে, নইলে ও পড়ে যাবে; সেই কোণটাতে নানারকম গাছপালা এলোপাতাড়ি লাগিয়ে দে, ওখানে একটা বন হয়ে উঠুক—এমনি ধারা কত কি!

আবার আশ্রমের মধ্যেই একই বাড়িতে থাকাও সইত না। গোড়াতে বাড়ি বদলানোর কোনো উপায় ছিল না, বাড়িই ছিল না বিশেষ, তার উপর টাকাও হাতে ছিল না। প্রথমে এসে শান্তিনিকেতন আশ্রমের দোতলা বাড়িটির উপরতলায় থাকতেন। তার পর 'দেহলী' বলে একটা ছোট দোতলা বাড়িতে অনেক দিন ছিলেন। বাড়িটি শালবীথিকার মাথায়, ছেলেদের যাওয়া আসার পথেই। খেলাধুলোর মধ্যে মাঝে মাঝে তারা শুনতে পেত কে যেন গলা খাঁকারি দিচ্ছে, অমনি বুঝতে পারত গুরুদেব তাঁর দোতলার ঘরে বসে লিখছেন।

এবার আমেরিকা থেকে ফিরে এসে আর সে বাড়িতে ওঠেন

নি। এখন যাকে উত্তরায়ণ বলা হয়, তার মধ্যে বিশাল একটা অট্টালিকা আছে, তারই পাশে কোনার্ক বলে একটা একতলা বাড়ি আছে। তখন এসব কিছুই ছিল না। এসে দেখেন যেখানে কোনার্ক সেখানে তাঁর জন্য দুটি মাটির ঘর করা হয়েছে। খোয়া দিয়ে তার মেঝে হয়েছে, দরমার বেড়া। এখন আর ও ঘরের কিছুই বাকি নেই।

আরও বাড়ি হল আশ্রমের. এখন যেখানে শিশুবিভাগ, সেই পাকা বাড়িটি হল। গুরুদেবই স্থির হয়ে এক জায়গায় বসে থাকেন না, আশ্রমই বা থাকে কি করে ?

এমনি করে দুটো চারটে বাড়ি তৈরি হয়, আশ্রম আরও বড় হয়। ১৯২২ সালে রবীন্দ্রনাথের মেজদা সত্যেন্দ্রনাথও মারা গেলেন। একে একে মাথার উপরে যাঁরা স্নেহচ্ছায়া দিয়েছিলেন, তারা বিদায় নিতে লাগলেন। কিন্তু কাজ তো আর তাই বলে বন্ধ থাকতে পারে না। ওই বছরেই বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি নাম দিয়ে বিশ্বভারতীর নিজস্ব পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হল। বিশ্বভারতীর কণ্ঠে ভাষা চাই, নইলে পাঁচজনে তার বিষয় জানবে শুনবে কি করে ? ইংরেজি ভাষায় ছাপা হয় এ কাগজ, মাতৃভাষায় কুলিয়ে ওঠে না বলে নয়। বাংলা ভাষা ক জনাই বা জানে ? বিশ্বভারতীর কথা জানাতে হলে যাঁরা অবাঙালী তাঁদেরি তো আগে জানাতে হয়, তা হলে ইংরেজি ভাষাতেই কাগজ ছাপাতে হয়।

কিন্তু শুধু বিশ্বভারতীর উদ্দেশ্য জানিয়ে কবিকে নিশ্চিন্ত থাকতে হয় নি। বিশ্বভারতীর বিরাট খরচ, তার টাকা সংগ্রহ করতে হত। নিজেই হেসে বলতেন, ভিক্ষের ঝুলি কাঁধে নিয়েছি। কিন্তু এ ঝুলি যে কবির মনে কত পীড়া দিত মাঝে মাঝে সে কথাও প্রকাশ না করে পারতেন না। একবার লিখেছিলেন, 'আমি ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি, হাতে নিয়ে বললে ঠিক

হয় না, কণ্ঠে নিয়ে। এ বিদ্যা আমার অভ্যস্তও নয় তৃপ্তিকরও নয়।…· জীবনের পূর্বাহ্ণ সোনার স্বপ্ন নিয়ে অতীত হয়েছে, জীবনের সায়াহ্ণ সোনার সন্ধান নিয়ে তিতো হয়ে উঠল।'

টিকিট বিক্রি করে, বক্তৃতা দিয়ে টাকা তোলা হত তখন। নাটক অভিনয় মাঝে মাঝে হত, বেশির ভাগই শান্তিনিকেতনে কিংবা কলকাতায়। শান্তিনিকেতনে অবিশ্যি টাকা নেওয়া হত না। পরে নানান জায়গায় অভিনয়, নৃত্যনাট্য, গানের আসর করে টাকা তোলা হত। অনেক সময় শুভাকাঙ্খীরা অর্থ দানও করতেন। কবির পক্ষে এ ভাবে অর্থ সংগ্রহ করা যে কত কষ্টের, সে কথা সহজেই অনুমান করা যায়। তার উপরে মনে মনে মাঝে মাঝে বড়ই ভাবনা হত এ ভাবে বিশ্বভারতীর আদর্শকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে কি না। এ বিষয়ে এই কথা লিখেছিলেন, 'মানুষের চিত্ত-ক্ষেত্রে যদি সে স্থান পায় তবেই সে বর্তে গেল।'

১৯২২ সালের শেষের দিকে এই রকম আরেকবার বেরিয়ে পড়লেন, দক্ষিণ ভারতে, পশ্চিম ভারতে, সিংহলে। দিনের পর দিন বক্তৃতা দিয়ে বিশ্বভারতীর আদর্শ প্রচার আর কিছু টাকা সংগ্রহ হল বটে কিন্তু অতিরিক্ত পরিশ্রমে আরেকবার তাঁর স্বাস্থ্য খারাপ হল। এবারও সবরমতী আশ্রমে গিয়েছিলেন। গান্ধীজী কারাগারে, সবরমতী অন্ধকার। কিন্তু আশায় বুক বেঁধে গান্ধীজীর শিষ্যরা কেমন কাজ করে চলেছেন দেখে কবি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

১৯২৩ সালে একটা দুঃসংবাদ এল, ইতালিতে রেল দুর্ঘটনায় পিয়ার্সন সাহেবের মৃত্যু হয়েছে। তার নামে শান্তিনিকেতনে একটি ছোট হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হল। এমনি করে ভালোয় মন্দয় বছরটা শেষ হল।

পিতা বাগানের সম্মুখে বারান্দায়। বালক রবি বেহাগে গান গাহিতেছে।

[বিশ্বভারতীর সৌজন্যে]
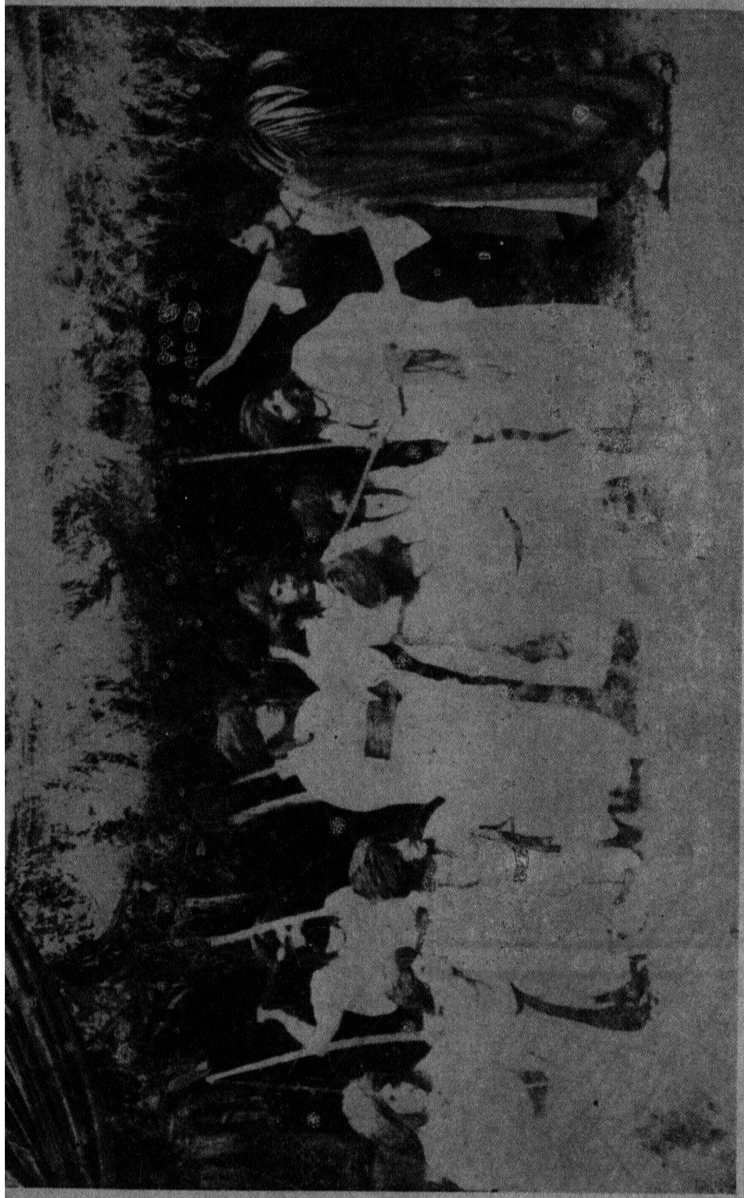
বাল্মীকি-প্রতিভা অভিনয়

ক্ষিতীন্দ্র   সুরেন্দ্র   অরুণেন্দ্র   বলেন্দ্র   যশঃপ্রকাশ   হিতেন্দ্র   গগনেন্দ্র   ঋতেন্দ্র   অবনীন্দ্র   রবীন্দ্রনাথ

[বিশ্বভারতীর সৌজন্যে]

দ্বাদশ অধ্যায়

পরের বছর ১৯২৪ সালে রবীন্দ্রনাথ আরেকবার চীন জাপান ঘুরে এলেন। অবিশ্যি এতদিন তিনি একটানা শান্তিনিকেতনেই ছিলেন মনে করলে ভুল হবে, দেশের মধ্যেই এদিকে ওদিকে হাওয়া বদল করেছেন। লিখেছেনও কিছু কিছু। বসন্তোৎসবের মিষ্টি গাছপালার গানগুলি যে শোনে সেই মুগ্ধ হয়। 'বিসর্জন' নাটক অভিনয় হল, বাষট্টির উপর কবির বয়স তখন। ওই বয়সে যুবক জয়সিংহ সেজে সে যে কি সুন্দর অভিনয় করলেন, তা ভুলবার নয়।

বিশ্বভারতীর কাজের আরম্ভটি বড় শুভ হয়েছে দেখা গেল। দেশ বিদেশ থেকে কত মনীষী পণ্ডিত এলেন কাজ করতে, চিঠি লিখলেন, বই পাঠালেন। চেক মনীষী লেসনি, জর্মান পণ্ডিত উইনটারনিটস্, ফরাসী রেনোয়ার নাম না করলে অন্যায় হয়। আরো অনেকে এসেছিলেন নানান দেশ থেকে। বিশ্বভারতীর দু বছর কেটে গেছে।

এবারকার বিদেশ যাত্রার একটা বিশেষত্ব ছিল। একজন মহানুভব ভারতবাসী খরচপত্রের জন্য টাকা দান করেছিলেন। তাঁর অনুরোধে কবির সঙ্গে আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন, শিল্পী নন্দলাল বসু, ও এল্মহার্স্ট গেলেন। অধ্যাপক কালিদাস নাগও সহযাত্রী হলেন। এতে বিদেশের লোকেরা ভারতের আরেকটু বেশি পরিচয়ের সুযোগ পেল। কবির মনের সেই তো বাসনা।

চীন দেশেই এবার কবির জন্মদিনের উৎসব হয়েছিল। ওখানে কবির বইএর নামে 'ক্রেসেন্ট মুন' বলে একটা সভা ছিল, তাঁরাই সব আয়োজন করেছিলেন। ইংরেজিতে সম্বর্ধনা হল, রবীন্দ্রনাথকে ওরা চু-চেন তান উপাধি দিলেন, তার মানে হল 'ভারতের মেঘমন্দ্রিত

প্রভাত'। এই নামটা একটা মূল্যবান পাথরে খোদাই করে ওঁর হাতে দেওয়া হল। উৎসবে ওদেশের জ্ঞানীগুণীরা অনেকে এসেছিলেন, শেষে কবিকে নানান উপহার দেওয়া হয়েছিল। বহুকাল পরে এ কথা মনে করে কবি লিখেছিলেন,

'একদা গিয়েছি চীন দেশে, অচেনা
তাহারা ললাটে দিয়েছে চিহ্ন,
তুমি আমাদের চেনা বলে।
ধরিনু চীনের নাম, পরিনু চীনের বেশবাস।
একথা বুঝিনু মনে, যেখানেই বন্ধু পাই
সেখানেই নবজন্ম ঘটে।'

এই জন্যই কবির বারে বারে বিদেশ যাওয়া, যাতে তাঁর জীবনের কাজ, জগতে মৈত্রী আনা, সেই কাজ এক ধরনের অমরত্ব পায়। পৃথিবীর অনেক ভাষাতেই এতদিনে তাঁর রচনার অনুবাদ বেরিয়ে গেছে।

চীনের তখন নব জাগরণ, কবি তাই দেখে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করেছিলেন, আবার ওদের য়ুরোপ প্রীতির নিন্দাও করেছিলেন।

কবির এই ভ্রমণের একটা ফল হল, এশিয়ার অনেকগুলি দেশের মধ্যে একটা বন্ধুত্ব স্থাপিত হল; এশিয়াটিক এসোসিয়েশন বলে একটা সংঘ গড়ে উঠল। তাতে আমেরিকা কিন্তু খানিকটা উদ্বিগ্ন হয়েছিল। জাপানের সঙ্গে তাদের তেমন সদভাব এমনিতেই নেই, আবার একজন এশিয়ার কবির প্রেরণায় এরা যদি দল বেঁধে বলীয়ান হয়ে ওঠে তবে তো মুশকিল!

ভারতে চীনা ভাষা, চীনা সাহিত্য ও সংস্কৃতির আদর হয়, এই ছিল কবির মনের সাধ। তাঁর অনুপ্রেরণাতেই শান্তিনিকেতনে চীনা শিক্ষা এতদূর অগ্রসর হতে পেরেছিল। অনেক চীনা ভাষায় পণ্ডিত

অধ্যাপক সেখানে কাজ করেছেন। আমাদের দেশেরও কয়েকজন শিক্ষাব্রতী চীনা ভাষা ও সাহিত্যে কম পাণ্ডিত্য অর্জন করেন নি।

দেশে ফিরে এসে রবীন্দ্রনাথ মাত্র দু মাস থাকলেন, তারপর আবার ঝোলা নিয়ে পাড়ি দিলেন। এবার গেলেন দক্ষিণ আমেরিকায়। এই দুই মাসের মধ্যে 'রক্তকরবী' নাটক লেখা হল। এই নাটকে যন্ত্রকে বড় বেশি ভক্তি করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আছে। যন্ত্র দিয়ে যত কাজই করা যাক না কেন, প্রাণের ও সৌন্দর্যের কোমল স্পর্শ না থাকলে সবই ব্যর্থ হয়, এই কথাই সম্ভবত কবি বলতে চেয়েছেন। কথাটা অবিশ্যি তার মনে নতুন করে উদয় হয় নি। 'মুক্তধারা' যখন লিখেছিলেন তখনও এই কথাই মনে ছিল, তবে এবার চীনে জাপানে গিয়ে সেখানকার নব জাগরণের মধ্যে যেন বড় বেশি যন্ত্রে বিশ্বাস দেখেছিলেন, হয়তো তাই থেকেই এই নাটিকার জন্ম।

যাই হক গেলেন কবি দক্ষিণ আমেরিকায়, সঙ্গে গেলেন রথীন্দ্রনাথ, পুত্রবধ প্রতিমা দেবী ও তাদের তিন বছরের পালিতা কন্যা নন্দিনী, যার বিষয় কবি লিখেছিলেন—'তিন বছরের প্রিয়া'। আর ছিলেন শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ কর।

দক্ষিণ আমেরিকার বিশেষত্বই হল এখানে ইংরেজ ও জর্মান ইত্যাদি দেশের কোনো প্রভাব নেই, আছে স্পেনের। এখানে এককালে স্পেনের খুব বড় উপনিবেশ ছিল। এখানকার আচার ব্যবহারই অন্য রকমের। এবার যাবার আগে কেন জানি কবির মনটা বড় বিষণ্ণ হয়ে গিয়েছিল। একটি বাঙালী মেয়ে তাকে যাত্রার দিন-পঞ্জিকা রাখতে বলেছিল, সেই থেকে 'যাত্রী' লেখা হল।

প্যারিসে রথীন্দ্রনাথরা থেকে গেলেন। প্রতিমা দেবী ইউরোপীয় মৃৎশিল্প শিখতে আরম্ভ করলেন, পরে শ্রীনিকেতনে এই বিদ্যা কাজে লেগেছিল। এদিকে কবি আর এল্মহার্স্ট সাহেব দক্ষিণ আমেরিকা

যাত্রা করলেন। কবির শরীর এবার খুব ভাল ছিল না। তবু জাহাজে বসে কাব্যরচনা চলতে লাগল। পথও অনেকখানি, তাই এই তিন সপ্তাহের পথে 'পূরবী'র তেইশখানি অপূর্ব কবিতা লেখা হয়ে গেল। ওই যে দিন-পঞ্জিকাটি শুরু হয়েছিল, সেটি কিন্তু ফ্রান্সে পৌঁছে বন্ধ হয়ে গেল। আর গদ্য ছুঁলেন না, সেই ফেরার পথের আগে।

পথে এতই অসুস্থ হয়ে পড়লেন যে, সে সময় যে সব কবিতা লিখলেন, তার মধ্যেও তার ছাপ পড়ে গেল। কবির মন যেন বিষণ্ণ, নিঃসঙ্গ। এ সেই নৈঃসঙ্গ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিদের চিরজীবনের যে সাথী হয়ে থাকে, কারণ তাদের চিন্তা-রাজ্যে সাধারণ মানুষের পৌঁছবার সাধ্য নেই। সঙ্গী সেখানে থাকে শুধু কবি তাঁর জীবনে যেটুকুকে সত্য বলে জেনেছেন। এই নৈঃসঙ্গের কথা মনে করেই 'যাত্রীতে' রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'জন্মকাল থেকে আমাকে একখানা নির্জন নিঃসঙ্গতার ভেলার মধ্যে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

জাহাজ থেকে নামলেন তাঁরা তিন সপ্তাহ পরে, আর্জেনটাইন দেশের প্রধান নগর বুয়েনস এয়ার্সে; গিয়ে একটা হোটেলে উঠলেন। শরীর এত খারাপ যে তখন আর পেরুর দিকে রওনা হওয়া গেল না। কিন্তু এখানকার বাসিন্দারাও আদর আপ্যায়নে কোনো ত্রুটি রাখলেন না। একটা বাগান বাড়িতে কবির থাকার জায়গা ঠিক করে দিলেন।

সেখানে ভিক্টোরিয়া দ্য-এস্ট্রাডা নামে একজন মহীয়সী নারীর সেবা যত্নে কবি আস্তে আস্তে সেরে উঠলেন। ভিক্টোরিয়ার নাম দিলেন 'বিজয়া'--'পূরবী' বইখানি কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁকেই উৎসর্গ করলেন। শরীরের সঙ্গে সঙ্গে কবির মনেও প্রফুল্লতা দেখা দিল। কত যে মধুর কবিতা রচনা করলেন তার ঠিক নেই।

শরীর ভালো হলে দু একটা উৎসবে যোগ দিতে পেরেছিলেন, কিন্তু পেরু যাওয়াব পথে বড় অসুবিধা, সেখানে যাওয়া হল না। অবশেষে ১৯২৫ সালের জানুয়ারী মাসে আবার য়ুরোপে যাত্রা

করলেন। শোনা যায় ভিক্টোরিয়া কবিকে একটি আরাম-কেদারা উপহার দিয়েছিলেন, সে আর কেবিনের সরু দরজা দিয়ে কিছুতেই ঢোকে না। শেষটা কেবিনের দরজার কব্জা খুলে ফেলে চেয়ারটা ঢোকানো হল। সে কেদারা এখনও আছে।

ফেরার পথে কবি ইতালিতে নেমে মুসোলিনীর সঙ্গে আলাপ করলেন। মুসোলিনী তখন ওখানকার একরকম কর্তা বলা চলে। দেশটাকে নতুন করে গড়ে তোলার নানান কথা তাঁর মুখে। তার বিষয়ে শুনে কবি বড় খুশি হয়েছিলেন, মুসোলিনীর ভারি প্রশংসাও করেছিলেন। তাতে আবার মুসোলিনীর শত্রুরা চটে গিয়েছিল।

পরে কিন্তু কবি বুঝেছিলেন যে, মুসোলিনীর সহানুভূতিশূন্য ও উদ্ধত মতবাদ অন্য কোনো লোকের কিংবা জাতির কোনো অধিকারই মানে না। মুসোলিনী সম্বন্ধে কবির তখন মত বদলায়, তার চিরদিনের সত্যের পূজারী তখনি সে কথাও প্রকাশ করেন। তাতে ইতালীয়রা গেল চটে। শুধু মুসোলিনী নিজে বিশেষ কিছু বললেন না।

এদিকে শরীরটা আবার মন্দের দিকে গেল। অবশেষে ১৯২৫ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে দেশে ফিরে এলেন। তখন শান্তিনিকেতনে মহাসমারোহে বসন্তকাল এসেছে। কবির কণ্ঠে গান এল। 'বসন্ত উৎসব' করবার আয়োজন হল আমবাগানে, কিন্তু অকালে এমনি ঝড়বৃষ্টি এল যে উৎসব হল কলাভবনের নতুন বাড়িতে।

দেশে এলেই নানান ব্যাপারে জড়িয়ে পড়তে হয়। দেশে স্বাধীনতা সংগ্রাম পূর্ণমাত্রায় চলেছে, ইংরেজ সরকার দমন-নীতি ধরেছেন, সামান্য কারণে, বিনা বিচারে যুবকদের সব ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। গান্ধীজী এতদিনে ছাড়া পেয়ে গেছেন, তিনি সমস্ত হৃদয় মন দিয়ে চরকা অন্দোলন শুরু করেছেন।

গান্ধীজীর মতে চরকাই দেশের একমাত্র ভরসা, যন্ত্রপাতি ত্যাগ করে ঘরে ঘরে চরকা বসুক। কবিও যন্ত্র দেবতাকে বেশি ভক্তি

করেন না, কিন্তু তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বলত, প্রয়োজন মত যন্ত্রপাতি ব্যবহার না করলে দেশের অগ্রগতি বন্ধ যাবে। সেবার যখন দলে দলে দেশ-সেবক যুবকরা পড়াশুনো ছেড়ে দেশের কাজে লেগেছিল, কবি তাঁর প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন, বলেছিলেন, বিদ্যা ত্যাগ করে দেশ সেবা হয় না। এবারও তেমনি মুক্তকণ্ঠে নিজের মত জানালেন। অনেকে ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁর সম্বন্ধে নানান অযথা নিন্দা করেছিলেন। কিন্তু গান্ধীজীর সঙ্গে যতই তর্ক-বিতর্ক হোক না কেন, গান্ধীজী কখনো তাঁকে ভুল বোঝেন নি। এই বছরই মে মাসে গান্ধীজী শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন।

ঠাকুর পরিবারের আরো দু জন এবার চলে গেলেন, বড়দা দ্বিজেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে মারা গেলেন আর তার অল্পকাল আগে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রাঁচিতে। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন পঁযষট্টি।

এই সময় কবিতা রচনা হয়েছিল অনেক, গদ্যে লেখা কম। তবে পুরনো লেখা নতুন করে কিছু লিখেছিলেন, গল্পকে নাটক করেছিলেন। 'গোড়ায় গলদ' হল 'শোধ-বোধ', 'শেষের রাত্রি' হল 'গৃহ প্রবেশ'। বারবার দেখা যায় কবির জীবনে কখনো বহু নতুন কবিতা লেখা হচ্ছে, গদ্যের অভাব, কখনো বা ঠিক তার উলটো।

সারা বছর ধরে শান্তিনিকেতনে যেন ঋতুরাজকে অভ্যর্থনা করার ব্যবস্থা করেছেন কবি। বসন্তোৎসব হল, বৃক্ষরোপণ হল, বর্ষামঙ্গল হল। তার মধ্যে তারি একবার লক্ষ্ণৌ হয়ে পূর্ববঙ্গে গেলেন। ঢাকায় অনেক বক্তৃতার আয়োজন হয়েছিল. দেশের লোকের কাছে মনের কথাটি বলবার অনেক সুযোগ পেয়েছিলেন কবি। রাজনীতির দলাদলি থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছেন, নিজেরও অপর কোনো উদ্দেশ্য নেই। সাম্যে ও মৈত্রীতে বিশ্বাস করেন, জনসাধারণের মনের কাছে পৌঁছতে চান. সাধারণ লোকে যে তাঁর কথা সাদরে গ্রহণ করবে এতে আর আশ্চর্য কি?

ঢাকা থেকে ময়মনসিংহ গিয়েছিলেন, সেখানকার লোকদেরও কবিকে দেখবার জন্য সে কি ব্যগ্রতা! ঢাকাতেও যেমন, এখানেও তেমনি মেয়েদের কাছে তার মনের এই কথা বলেছিলেন, যে অতিথি-সেবাই হল মেয়েদের কাজ। এতকাল মেয়েরা ঘরের অতিথির সেবা করে এসেছে, এবার তেমনি করে বিশ্বের অতিথিদের সেবাতেও যোগ দিক।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

কুমিল্লাতে নমঃশূদ্রদের এক অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ যোগ দিয়েছিলেন। সেখানে মনের মধ্যে সম্ভবতঃ আরেকটা গাছের বীজ অঙ্কুরিত হল। লোকে মাঝে মাঝে নিন্দা করে বলত, রবি ঠাকুর হল গিয়ে শৌখীন কবি, সেজেগুজে অট্টালিকায় বসে নানারকম শখের বাণী দেন, নাচগান নিয়ে মেতে থাকেন, বারবার বিলেতে যান হাওয়া খেতে, নাটক নভেল যা লেখেন সে-ও বড়লোকদের সমস্যা নিয়ে। দেশের মাটিতে কাদা মেখে যারা খেটে খায়, তাদের ধার ধারেন না রবি ঠাকুর। গান যা লেখেন, কবিতা যা লেখেন সেও এমন সব গূঢ় তত্ত্ব নিয়ে, এমন মার্জিত ভাষায় যে, দেশের কোটি কোটি জেলে জোলা চাষা মজুরদের তার এক বর্ণ বোঝার সাধ্য নেই।

কথাটা যে কত ভুল, সে আর কে বলবে। রবীন্দ্রনাথ একের মন্ত্রে বিশ্বাস করতেন। দেশ বললে গোটা দেশটাকেই বুঝতেন, বড়লোক গরীবলোক আলাদা করে ভাবতেন না। যে সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশার কথা নিয়ে লিখতেন, সে সব মানুষেরই অন্তরের কথা, গরীব বড়লোক বলে কিছু নেই সেখানে। কাজের বেলাতে যে কুটির শিল্প উদ্ধার করা, গ্রামের উন্নতি করা, লোকসংগীত খুঁজে খুঁজে সংগ্রহ করা, এ সবই দেশের জনসাধারণের জন্য, বড়লোকদের জন্য নয়।

যারা তাকে চিনত, তারা জানত তার মনে একটুকু বিলাসিতা ছিল না। এ নইলে চলবে না ও নইলে চলবে না, এমনি কথা তিনি কখনো বলতেন না। যখন যেমন দরকার পড়েছে, সেই ভাবে থেকেছেন। কুটিরেও যেমন, রাজপ্রাসাদেও তেমনই। ভালো খাব, ভালো পরব, পাঁচজনে আমায় মাথায় করে রাখবে—এ তাঁর জীবনের

উচ্চাশা ছিল না। সারা জীবন কেবল এই কথাই ভেবেছেন, যা করতে এসেছি এই জগতে, সে বুঝি আর হল না।

কি করতে এসেছিলেন তিনি? কি উদ্দেশ্য নিয়ে মহামানবরা জন্মান? সে কি মানবজাতিকে সুখী করে দেবার জন্য? তা তো মনে হয় না, জন্তু-জানোয়াররাও তো পেট ভরে খেতে পেলে, শরীরে আরাম পেলে, পরম সুখে দিন কাটায়। সে ধরনের সুখ তো কবিরা কখনো কামনা করেন না। রবীন্দ্রনাথও বারে বারে দুঃখ ভোগ করবার শক্তি চেয়েছেন, ভগবানের মঙ্গল বিধানে বিশ্বাস চেয়েছেন। মানুষের জীবনের প্রতি ভক্তি চেয়েছেন। মানুষ যদি অন্ধ, সংকীর্ণ, নীচ, নিষ্ঠুর হয়, তা হলে যে মনুষ্যত্বের অসম্মান হয়, তাই সারাজীবন প্রাণপণে চেষ্টা করেছেন, মানুষরা যেন সুন্দরভাবে উপযুক্তভাবে বাঁচতে পারে। যেখানে যা কিছু সুন্দর আছে, সব সংগ্রহ করে এনে মানুষদের দিতে চেয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে সে সব নিতে পারার যোগ্য হতেও বলেছেন। সেই জন্য সাধনা করতে বলেছেন।

একটুখানি গুণের পরিচয় পেলেই সে মানুষকে মাথায় করে রেখেছেন, সে যেন বিশ্বভারতীর কাজে লাগে তার চেষ্টা করেছেন।

গান দিয়ে, শিল্প দিয়ে, সাধনা দিয়ে, ভক্তি দিয়ে জীবনটাকে কবি মধুময় করতে চাইতেন। যারা এটুকু বুঝত না তাদেরই মন্দ ভাগ্য। গুরুদেব কোনোদিনও শখের জীবন যাপন করেন নি। শৌখীনতা ছিল তাঁর পায়ের পাদুকা, যার উপরে থাকত সমগ্র মানুষটা, পুজোর মন্দিরে ঢোকবার সময় তাকে বাইরে খুলে ফেলে রেখে ঢুকতেন।

বিদেশেও এই যে ঘন ঘন যাওয়া, এর মধ্যে মনের চঞ্চলতাও যতখানি ছিল, কোথায় কোন উন্নততর জীবনের সন্ধান পাওয়া যায়, এ বাসনাও ততখানি ছিল। আর বিশ্বভারতীর অভাব মেটাবার প্রয়োজন তো ছিলই।

১৯২৬ সালে নিমন্ত্রিত হয়ে আরেকবার ইতালি গিয়েছিলেন। গতবারের ইতালির রাজশক্তির নিন্দা করা সত্ত্বেও, ইতালি থেকে তাঁকে ডেকেছিল বলে অনেকে আশ্চর্য হয়েছিলেন। কবি তবু গিয়েছিলেন আর মুসোলিনীর কাছ থেকে অনেক সৌজন্য পেয়েছিলেন। তাঁর সমস্ত রচনাই প্রায় ওঁদের ভাষায় অনুবাদ হয়েছিল দেখে খুশিও হয়েছিলেন। মুসোলিনীর নিন্দা করা সত্ত্বেও তিনি ভালো ব্যবহারই করেছিলেন। অনেকে বলেছিল, মুসোলিনী পৃথিবীর চোখে নিজের আসন আরেকটু উঁচু করতে চান বলে ভারতের কবিকে এত আদর দেখানো!

ইতালি থেকে রবীন্দ্রনাথ আবার ইংল্যাণ্ড গেলেন, তারপর নরওয়ে, জর্মানি, চেকোস্লোভাকিয়া, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গারী, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, গ্রীস, তুর্কি হয়ে ঈজিপ্ট, তারপরে আবার নিজের দেশে। যেখানেই গেলেন সেখানকার শ্রেষ্ঠ মানুষদের সঙ্গে পরিচয় হল, জনসাধারণকেও নিজের আদর্শের কথা, নিজের দেশের কথা বলতে পারলেন, কত যে আদর পেলেন। এখানে ওখানে স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপে তাঁরা কেউ কেউ কবিকে অনুরোধ করতেন একটা গাছ পুঁতে দিয়ে যেতে। সে সব গাছের কোনো কোনোটি এখন বিশাল মহীরুহ হয়ে উঠে বাঙালী কবির মৈত্রীর কথা সেই বিদেশের লোকদের মনে করিয়ে দিচ্ছে।

এমনি করে সেকালের বৃক্ষরোপন অনুষ্ঠানও একজন কবির হাত দিয়ে দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়ল। এই সময় কবি 'বনবাণী'র কবিতাগুলি লিখতে আরম্ভ করেছিলেন। ও যেন বই নয়, সবুজ গাছের উৎসব, পড়লে হৃদয় মন স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে। দেশে ফিরে এসে দেখেন শান্তি নেই কোথাও। দিল্লিতে সেবার স্বামী শ্রদ্ধানন্দ নিহত হলেন, তাই শুনে কবির কত দুঃখ। পশু-বল যেখানেই প্রয়োগ করা হয়, সেখানেই মনুষ্যত্বের অপমান হয়, এ কথা কবি মর্মে মর্মে অনুভব

করতেন। দুর্বলের উপরে বলবান অত্যাচার করেই থাকে, দুর্বল যদি শুধু কাঁদুনি গায় সে অত্যাচার বেড়েই চলে। কাজেই দুর্বলকে সবল হতে হবে। নিজের সম্মান রক্ষার ভার নিজেকে নিতে হবে। এ-কথা কবি বহুবার বলেছেন। তাঁর 'স্বদেশী সমাজ' নামক প্রবন্ধে বহুকাল আগেও এ বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। প্রাণ বাঁচাতে হলে প্রাণশক্তি চাই।

নিজের ছিল প্রচণ্ড শক্তি, কি দেহের কি মনের। বয়স ক্রমশঃ সত্তরের দিকে চলেছে তবুও প্রতিভা তেমনি বলিষ্ঠ। দীর্ঘ শরীরটা যেন সামান্য একটু সামনের দিকে ঝুঁকেছে কিন্তু যৌবনের দীপ্ত তেজ এখনও তার কাছে হার মেনে যায়। গলা তুলে কথা কইলে কড়ি-বরগা রিম্-ঝিম করে ওঠে। গানের গলা তেমন আর নেই, কিন্তু গানের প্রতিভার যেন হাজার পাপড়ি একে একে খুলে যাচ্ছে। শান্তিনিকেতনে 'নটরাজ' নাম দিয়ে নতুন ধরনের নৃত্য-নাট্যের ব্যবস্থা করলেন।

ওদিকে 'বিচিত্রা' বলে নতুন একটা পত্রিকা বেরুচ্ছে, তার জন্য নতুন নতুন রচনা হচ্ছে। এই পত্রিকাতেই নতুন উপন্যাস, 'তিন পুরুষ' বেরুল, পরে তার নাম হল 'যোগাযোগ'। এই উপন্যাসে কবি কেমন সুন্দর করে দেখিয়েছেন পিতামহদের জীবনের ধারা পুত্রকন্যার কাছে এসে অন্য রূপ নিচ্ছে, কিন্তু তৃতীয় পুরুষ যেই জন্ম নিল, অমনি তার জন্য সবাই তাদের দাবী ছেড়ে দিচ্ছে।

১৯২৭ সালে আরেকবার বিদেশ যাত্রা। এই নিয়ে হল নয় বার দেশের মাটি ছেড়ে যাওয়া। এবার গেলেন পূব সাগরে, মালয়, জাভা, বলি, শ্যামদেশ। সঙ্গে ছিলেন অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টো-পাধ্যায়, শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ কর, আরো কেউ কেউ। উচ্ছ্বসিত হয়ে সে সব দেশের লোকেরা ভারতের কবিকে অভ্যর্থনা করল। কবির মনে পড়ল ভারতের সঙ্গে এই দ্বীপপুঞ্জের যোগাযোগ এই প্রথম নয়।

বহু যুগ আগে ভারতীয় বণিকরা আসত বাণিজ্য করতে, ধর্মগুরুরা এখানে হিন্দুধর্ম বৌদ্ধধর্ম বিস্তার করেছিলেন, এখানে ভারতীয়রা এসে বসবাসও করেছেন। আবার এতকাল পরে কবি এসেছেন ভারতের বাণিজ্য নিয়ে নয়, ভারতের উদাত্ত বাণী নিয়ে। এখানে এসে এদের আপন জন বলে চিনতে পেরেছেন। 'বিজয় লক্ষ্মী' নামের কবিতায় এই মনের ভাবের অনেকখানি প্রকাশ করে-ছিলেন।

মাস পুরে যাবার আগেই কবি আবার দেশে ফিরেছেন, 'নটরাজ' নৃত্যনাট্যকে নতুন করে সাজিয়ে তার নাম দিয়েছেন 'ঋতুরঙ্গ'। কলকাতায় 'ঋতুরঙ্গ' অভিনয়ও হল। কাজের চাকা ঘুরেই চলেছে, আরো কত বিদেশী এলেন গেলেন। তারই মধ্যে কবির সাতষট্টি বছর বয়স হল। জন্মদিনে কবিকে ওজন করা হল, দাঁড়িপাল্লার এক দিকে ওঁর নিজের লেখা বই দিয়ে। তারপর সে সব বই বিলিয়ে দেওয়া হল।

আরেকবার বক্তৃতা দেবার জন্য এই সময় বিলেত যাবার কথা হয়েছিল, কিন্তু শরীর খারাপ বলে আর যাওয়া হল না। তার বদলে পণ্ডিচেরি গিয়ে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে দেখা করলেন। সিংহল, ব্যাঙ্গালোর বেড়ালেন। ব্যাঙ্গালোরে 'শেষের কবিতা' উপন্যাসখানি শেষ করলেন। বিদেশ গেলেন আবার দুবছর পরেই, ক্যানাডার নিমন্ত্রণে। জাপান হয়ে গেলেন, ক্যানাডা থেকে যুক্তরাষ্ট্রেও গেলেন, কয়েকটি বিখ্যাত জায়গায় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিলেন। এমন সময় ওঁর পাসপোর্ট গেল হারিয়ে। এমন বিশ্ব-বিখ্যাত কবির পাসপোর্ট হারানো ব্যাপার নিয়ে ওখানকার কর্তৃপক্ষ এমনি হাঙ্গামা বাধালেন, যে শেষ অবধি তিতিবিরক্ত হয়ে কবি আবার জাপান যাত্রা করেছিলেন। তারপর আবার দেশে ফিরলেন।

দেশে যখনই থাকেন কাজেকর্মে একেবারে ডুবে যান। এখানে

ওখানে সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ লিখছেন, বক্তৃতা দিচ্ছেন, সভাপতিত্ব করছেন, কাব্যরচনা করছেন, নাটক লিখছেন, সেগুলি অভিনয় করাচ্ছেন। প্রথম প্রথম শুধু গানের নাটক লিখতেন, তারপর মুখের কথার সঙ্গে গান জুড়লেন, শেষে নাটকের সঙ্গে গান ও নাচ দুই-ই যোগ করলেন। 'রাজা ও রাণী' ভেঙে হল 'তপতী'। জোড়াসাঁকোতে টিকিট বেচে 'তপতী' অভিনয় হল, আটষট্টি বছর বয়স কবির, তিনি সাজলেন যুবক বিক্রম। দেখে লোকে মুগ্ধ হল। দেখতে দেখতে বিশ্বভারতীর কাজ একেবারে জমে উঠেছে। জাপান থেকে যুযুৎসু শেখাতে অধ্যাপক তাকাগাকি এসেছেন। পড়াশুনো পুরোদমে চলেছে।

তারই মধ্যে কবি হঠাৎ ছবি আঁকতে শুরু করে দিলেন। অনভ্যস্ত হাতের কাঁচা ছবি নয়, পাকা ওস্তাদের অদ্ভুত কল্পনার সব মূর্তি, জন্তু-জানোয়ার গাছপালা। এসব ছবির মধ্যে ভারি একটা বলিষ্ঠতা আছে, হঠাৎ দেখলে চমকে যেতে হয়। কিন্তু কবির গদ্যে, কাব্যে, গানে, নৃত্যের ছন্দে যেমন একটা সামঞ্জস্য দেখা যায়, সব যেন একসঙ্গে ঐকতানের মত বেজে ওঠে, কোনোটার সঙ্গে কোনোটার বিরোধ থাকে না, এ ছবি আঁকা ঠিক তার উল্টো।

এরা হল কবির খেয়ালের উদ্ভট সব ছবি, মনের পেছনে কোথায় যেন বছরের পর বছর বন্ধ ছিল। হঠাৎ কবি চাবিগাছি নিয়ে দোর খুলে দিয়েছেন, তারাও অমনি হুড়মুড় করে একেবারে মঞ্চের সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেছে।

অদ্ভুত সে ছবি আঁকা, কালো অন্ধকারের মধ্যে থেকে যেন কোথাও আলো ফুটেছে, কোথাও বা প্রাগ্-ঐতিহাসিক যুগের জানোয়ার কি পাখি হঠাৎ যেন বেঁচে উঠেছে, আশ্চর্য মানুষরা অন্ধকারের পরদা ঠেলে বেরিয়ে আসছে, কথায় সে সব ছবির বর্ণনা দেওয়া শক্ত। পৃথিবীতে ও ধরনের জন্তু মানুষ কেউ কখনো দেখে

নি, কিন্তু তাদের মধ্যে এমনি একটি অসাধারণ শক্তি আছে, যে দেখলেই বুকের মধ্যে ধক্ করে ওঠে।

কুঁড়েমির সময় যে এসব আঁকতেন তাও নয়, কে যেন তাঁকে ধরে আঁকিয়ে নিত। আঁকার তাগিদ যেই না মনের মধ্যে এল, আর কাগজ পেনসিল তুলি রঙের অপেক্ষায় থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হত না। হাতের কাছে যা পেতেন, বইএর মলাট, ফেলে দেওয়া কাগজের টুকরো, সাধারণ কালি কলম, তাই দিয়েই আশ্চর্য সব ছবি এঁকে ফেলতেন। ছোটবেলায় নাকি ছবি আঁকার শখ ছিল, হয়তো বা এ তারি পরিপূর্ণ ফল।

চতুর্দশ অধ্যায়

উনসত্তর বছর বয়সে আরেকবার য়ুরোপ গেলেন। প্যারিসে তাঁর ছবির প্রদর্শনী হল। য়ুরোপের শিল্পীরা একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। একজন বৃদ্ধ ভারতীয় কবি যে এ ধরনের ছবি আঁকতে পারেন, এ তাঁদের কল্পনাতেও কখনো আসে নি।

সেখান থেকে ইংল্যাণ্ডে গিয়ে গতবার অসুস্থতার জন্য যার প্রতিশ্রুতি রাখা হয় নি, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই বক্তৃতাগুলি দিলেন। এখানেও ছবির প্রদর্শনী হল।

ওদিকে দেশের খবর কিন্তু মোটেই ভালো নয়। গান্ধীজী সত্যাগ্রহ শুরু করেছেন। ডাণ্ডি মার্চের খবর সেটা, তারপর গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, চট্টগ্রামে স্বদেশীরা অস্ত্রাগার লুঠ করেছে, শোলাপুরে সামরিক শাসন চলছে, সারা দেশে জাতীয় কংগ্রেসকে বেআইনী বলে ঘোষণা করা হয়েছে। গান্ধী-টুপি পরা পর্যন্ত অন্যায় কাজ বলে ধরা হচ্ছে।

এসব খবর শুনে কবির প্রাণ একেবারে চঞ্চল হয়ে উঠল। কিন্তু দূরে থেকে কি-ই বা করতে পারেন। এখানকার পত্রিকাদিতে ও বক্তৃতার মধ্যে দিয়ে ভারতের সম্মান [illegible] ধরবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। সে সময়ে বিলেতে 'গোল টেবিল বৈঠক' বসল। সেখানে ভারতবর্ষের বিষয় আলোচনা হবে। গান্ধীজীকেও নিমন্ত্রণ করা হল, কিন্তু তিনি এমন কতকগুলো শর্ত দিলেন, যাতে ইংরেজ সরকার রাজী হলেন না। কবির বড় [illegible]। গান্ধীজী এলে ভারতবর্ষের দিকটা বলতো যেন ভালোই হত। আবার এ কথাও বলেছেন যে নিজের দলের সংশয়ের চেয়ে গান্ধীজীর সততার উপর যেন তাঁর বেশি আস্থা থাকে এই তিনি চান।

এবার ইংল্যাণ্ড থেকে জর্মানি, ডেনমার্ক, রাশিয়া, আমেরিকা, হয়ে এগারো মাস পরে দেশে ফিরেছিলেন। রাশিয়ার সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষাপ্রসার ও সমবায়নীতি তাঁর ভালো লেগেছিল। জন্ম হয়েছিল জমিদার বংশে, কিন্তু এই জমিদারী প্রথার উপর ক্রমে মনে ঘৃণা জমে যাচ্ছিল। এই সময়ে রথীন্দ্রনাথকে একটা চিঠিতে সে কথা লিখেও ছিলেন। তাঁর 'রাশিয়ার চিঠি' পড়লে আরও মতামত জানা যায়।

গুণীদের মন হয় বড় সূক্ষ্ম। চিন্তারাজ্যের এতটুকু বাতাসের দোলাতে সাড়া দেয়। যে গুণগুলি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন, তারা পরিপূর্ণতা পেয়েছিল সারা জীবন ধরে তিনি যা দেখেছিলেন, শুনেছিলেন, পড়েছিলেন, ভেবেছিলেন, যাদের সঙ্গে মিশেছিলেন, যে সব দেশে ভ্রমণ করেছিলেন, এমন কি যে সব স্বপ্ন দেখেছিলেন, এ সমস্তর মধ্য থেকে কণা কণা আহরণ করে নিয়ে। একদিনে তিনি জন্মান নি, যতদিন বেঁচেছিলেন, বারে বারে যেন কোথা থেকে নতুন প্রাণের সন্ধান পেয়ে নতুন নতুন তারুণ্যে বিভূষিত হয়ে উঠতেন। সত্তর বছর বয়সেও তাঁর চোখ থেকে মুখ থেকে এমন একটা উজ্জ্বল তারুণ্য উদ্‌ভাসিত হত, যা যে কোনো যুবকের তারুণ্যকে লজ্জা দিত। এই তারুণ্যের মূলে ছিল তাঁর ওই জানবার, বুঝবার, গ্রহণ করবার, কাজে লাগাবার অসাধারণ ক্ষমতা।

এবার বিদেশে যাবার আগে পর্যন্ত, বিদ্যালয়ের অনেক কাজের ভার নিজের হাতে নিয়েছিলেন আর এমন দক্ষতার সঙ্গে চালাচ্ছিলেন যে দেখে অবাক হতে হত। শরীর খারাপ হয়ে মাঝে কলকাতায় এসেছিলেন, বেশ কিছুদিন চিকিৎসকদের হাতেও থাকতে হয়েছিল, তারপর হঠাৎ শান্তিনিকেতনে ফিরে গিয়ে কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিলেন। একজন বন্ধুকে লিখলেন---কাজে আমার ক্ষতি করে না, কাজই আমার প্রাণ।

এতদিনে এ কথা পৃথিবীতে সর্বজন-স্বীকৃত হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত মহাপুরুষ গান্ধীজী ছাড়া আর কেউ বেঁচে নেই। সত্তর বছর বয়স হয়েছে কবির, দেশের লোকে ঘটা করে তাঁর জয়ন্তী উৎসব করল।

দেশ বিদেশের জ্ঞানী গুণীরা শুভকামনা পাঠালেন, কলকাতার টাউন হলের সামনে, রাজপথকে সাজিয়ে রাজসভার মত করা হল, সেখানে হাজার হাজার লোকে মিলে কবির সম্বর্ধনা করলেন। ছবির প্রদর্শনী হল, মেলা বসল, নাট্যাভিনয় হল, সমস্ত হৃদয় দিয়ে যে দেশের লোকে রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করেছে সকলেই সে কথা বুঝল।

তারই মধ্যে খবর এল গান্ধীজী ও অন্যান্য দেশনেতারা আবার গ্রেপ্তার হয়েছেন। তখুনি কবি আনন্দোৎসব বন্ধ করে দিলেন।

মন বড় খারাপ, কলকাতার কাছে গঙ্গার তীরে খড়দহে একটা ভাড়াবাড়িতে কিছুদিন থাকলেন। এখানে অনেকগুলি কবিতা লিখেছিলেন। সে সব পরে ছাপা হল 'বিচিত্রিতা' 'বীথিকা' 'পরিশেষ' ইত্যাদিতে। 'বিচিত্রিতা' বইখানির একটা কাহিনী আছে। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে কয়েকটি ভালো ছবি দেখে রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা হল, ওই ছবিগুলিকে ভাষা দেবেন। খড়দহে ওই ছবিগুলি দেখে 'বিচিত্রিতা'র কবিতা রচনা হল।

এই খড়দহ থেকেই কবি সে বছর ২৬শে জানুয়ারি ইংল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রীকে এই অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে চিঠি লিখেছিলেন, তবে এ দেশের ইংরেজ সরকার সে চিঠি যথাস্থানে পুরোপুরিভাবে প্রকাশিত হতে দেন নি।

গান্ধীজীকে স্মরণ করে কবি তাঁর বিখ্যাত 'প্রশ্ন' কবিতাটিও এখানে বসে রচনা করেছিলেন। এদিকে পারস্য দেশের অধিপতি, লোকে যাঁকে 'শাহ' বলে, কবিকে তাদের দেশে যাবার জন্য নিমন্ত্রণ

করেছেন, সে নিমন্ত্রণ কবি না গ্রহণ করে কি করেন, সেখানে তো কখনো যাওয়া হয় নি। এবার এরোপ্লেনে গেলেন। সেখানকার সে রাজকীয় আতিথ্য কল্পনা করা যায় না, গোলাপ ফুল দিয়ে তাঁরা পথঘাট ঢেকে ফেলেছিলেন। দেখবার শুনবারও অনেক কিছু ছিল, পুরনো শহরের ভগ্নাবশেষ, হাফেজের কবর ইত্যাদি। সেখান থেকে ইরাকে, আরবদেশে গেলেন। নতুন একটা প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপনা হল স্বাধীন দুটি মুসলমান রাজ্যের সঙ্গে। ইরাণ থেকে একজন অধ্যাপক শান্তিনিকেতনে এসে মুসলিম সাহিত্য ও সংস্কৃতি শিক্ষা দেবেন স্থির হল। এমনি করে বিশ্বভারতীর বাণীকে কবি দেশ-দেশান্তরে পৌঁছে দিলেন।

দেশে এসে অল্প ক'দিনের মধ্যে নিদারুণ দুঃখ পেতে হল। তাঁর একমাত্র নাতি, তাঁর সব চাইতে ছোট মেয়ে মীরাদেবীর একমাত্র পুত্র নীতীন্দ্রনাথের মৃত্যু হল বিদেশে। জীবনের অন্যান্য শোকের আঘাতকে যেমন বুক পেতে নিয়েছিলেন, একেও তেমনি নিলেন। লোকের সামনে নিজের শোককে বড় করে দেখানোর মধ্যে এমন একটা মানসিক দৈন্য আছে যে কবির পক্ষে সেটা সম্ভব নয়। কাজের মধ্যে ডুবে রইলেন, এমন কি বন্ধুরা যে বছর বর্ষামঙ্গল উৎসব বন্ধ রাখতে চেয়েছিলেন, কবি তাদের বারণ করলেন।

কর্মক্ষেত্রে আবার অর্থাভাব দেখা দিয়েছে। কবি এবার কিছু টাকা রোজগার করবার উপায় দেখলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে রামতনু লাহিড়ীর স্মরণে যে বাংলা সাহিত্যের বক্তৃতামালা হয়, তারই আসন অলংকৃত করতে অনুরোধ করলেন। সে বছরের 'কমলা লেকচার' দিতেও তিনি নিমন্ত্রিত হলেন।

তা ছাড়া নিজের লেখা তো ছিলই। ওদিকে দেশের দিকেও না তাকালেই নয়। গান্ধীজী তাঁর হরিজন আন্দোলন চালাচ্ছেন। ইংরেজ রাজ এ দেশের হিন্দু-মুসলমান বিরোধ বাড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা

করে, মনের উপর। কবি চিরদিন বিশ্বাস করে এসেছেন, মানুষকে ভালোর দিকে নিতে হলে, তাকে আগে ভালোর আদর্শটাকে বোঝাতে হবে, সে নিজে থেকে যখন ভালোটাকে গ্রহণ করবে, তখনই সেটা সার্থক হবে, তার আগে নয়।

এর কিছুদিন পরেই গান্ধীজী মুক্তি পেলেন। বাইরে এসে সত্যাগ্রহ আন্দোলন তুলে নিলেন, নিজের সমস্ত শক্তি লাগালেন অস্পৃশ্যতা দূর করবার কাজে।

এদিকে শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতীর কাজ চলেছে। কর্মীদের মধ্যে অদল-বদল তো হবেই। এর আগেই কলেজ খোলা হয়েছে, বিশাল 'উদয়ন' বাড়ি তৈরি হয়েছে, তবে কবি সব সময় সেখানে থাকেন না। 'কোণার্কে'র মাটির বাড়িরও অনেক বদ-বদল হয়েছে। কবির পঁচাত্তর বছর যখন বয়স তখন মাটির বাড়ি 'শ্যামলী' উঠেছে সেখানে বড় নিরিবিলিতে দিন কাটাতে পারবেন, এই ছিল কবির মনের আশা। কিন্তু সে আর হল কই? মাটির বাড়িতে কবি-সম্রাট বাস করছেন, দলে দলে লোক আসত তাই দেখতে। গান্ধীজীও একবার এই বাড়িতে বাস করে গেছেন। খুব ভালো লেগেছিল তাঁর।

কিন্তু 'শ্যামলীতে'ও মন বসে নি কবির, মন তাঁর কোথাও বসবার নয়। শ্যামলীর পরে 'পুনশ্চ' বলে আরেকটা বাড়ি হল। তার চেহারা ঠিক শ্যামলীর উলটো। শ্যামলী যেন গাঁয়ের মেয়ে, ঘোমটা দিয়ে নিজেকে আড়াল করে রেখেছে, ঠাণ্ডা, কোমল, চুপচাপ স্বভাবটি। আর 'পুনশ্চ' সাদা উজ্জ্বল, মাঝখানে একটি বড় ঘর, চারদিকে কাচে-মোড়া বারান্দা, যেন চোখ মেলে চাইছে, বাইরেটাকে ভিতরে আসবার জন্য হাতছানি দিয়ে ডাকছে। ঠিক মনে হত যেন তাই দেখে গাছরা সব কাছাকাছি এসেছে, আকন্দ ফুলরা একেবারে দোরগোড়ায় এসে হাজির।

'পুনশ্চ'র পরেও আরেকটা বাড়ি হয়েছিল, তার নাম সবাই

বলে 'উদীচী'। দোতলা পাকা বাড়ি, বাইরে দিয়ে তার সিঁড়ি, ভারি ছিমছাম দেখতে, সিঁড়ি বেয়ে লতাগাছে ফুল ধরে থাকে। এই বাড়িতেই শেষের দিকে কবি ছিলেন।

তবে যে সময়ের কথা হচ্ছিল, তখন সবেমাত্র 'শ্যামলী' তৈরি হয়েছে। 'শ্যামলী'র নামে কবি কবিতাও লিখেছেন, শ্যামলীর সামনে দাঁড়িয়ে কবির বিখ্যাত ছবি কে না দেখেছে?

পঞ্চদশ অধ্যায়

কবির এতটা বয়স হলেও কাজ থামল না। ১৯৩৩,১৯৩৪ সালেও দেশের মধ্যে বেড়ানো বন্ধ হল না, হায়দ্রাবাদ, মহীশূর, মাদ্রাজ, সিংহল। 'শেষ সপ্তক' কবিতার বই প্রকাশিত হল, কলকাতায় সাহিত্য সম্মেলনের উদ্‌বোধন করলেন ; কাশী গিয়ে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে যোগ দিলেন ; কলকাতায় রঙ্গমঞ্চে 'রাজা' অভিনয় হল, নিজে ঠাকুরদা সাজলেন ; নানান আলোচনা সভায় যোগ দিলেন ; 'চিত্রাঙ্গদা'কে নৃত্যনাট্য করে নিউ এম্পায়ার থিয়েটারে দেখালেন ; আবার বিশ্বভারতীর জন্যে টাকা তুলতে বেরুলেন।

বুড়ো বয়সে টাকার জন্য রবীন্দ্রনাথকে ঘুরে বেড়াতে দেখে গান্ধীজী বড় দুঃখিত হলেন। কবিকে অমন করে বেড়াতে বারণ করে নিজের ভক্তবন্ধুদের মধ্যে থেকে ষাট হাজার টাকা তুলে দান করলেন। পরে এক সময় কবি তাঁকে বিশ্বভারতী সম্বন্ধে নিজের দুশ্চিন্তার কথা বলেছিলেন, গান্ধীজীকে ভার নিতে অনুরোধ করে-ছিলেন। অনেকদিন পরে যে স্বাধীন ভারতের সরকার বিশ্বভারতীর ভার নিয়েছেন, সেও গান্ধীজীর এই পুরনো প্রতিশ্রুতির জন্যই।

১৯৩৭ সালে কবির বয়স ছিয়াত্তর পার হয়ে গেছে, তখনও সমানে কাজ করে যাচ্ছেন। এইবার গুরুতর রোগে ধরেছিল তাঁকে, বিখ্যাত চিকিৎসক স্যার নীলরতন সরকার তাঁকে সারিয়ে তুললেন। দেশের গণ্যমান্য লোক কত যে তাঁকে দেখতে এসেছিলেন তার ইয়ত্তা নেই।

ওদিকে শান্তিনিকেতনের কাজ আরো বাড়তে লাগল। সংগীত-ভবন, কলাভবন, চীনভবন, হিন্দীভবন, একে একে সব হল। জহরলাল নেহরু নিজে এসে হিন্দীভবনের দ্বার উদ্‌ঘাটন করলেন,

কিন্তু কবির সেদিন শরীর ভালো নয়, নিজে সেটা দেখতে পেলেন না।

মৃত্যু শোকও আরও পেতে হয়েছিল। তাঁর চিরদিনের গানের ভাণ্ডারী দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, তাঁর বড় আদরের আত্মীয়, অকালে মারা গেলেন। বন্ধুদের দলেও ফাঁক দেখা দিতে লাগল, তবু কবির কাজের আর শেষ নেই। কবির মন চিরকাল অন্য জগতে বাস করে, এই সময় তিনি তাঁর সেক্রেটারি কবি অমিয় চক্রবর্তীকে লিখেছিলেন, 'আজ আমার মন যে ঋতুকে আশ্রয় করে আছে, সে দক্ষিণ হাওয়ার ঋতু, অন্তরের দিকে তার প্রবাহ, কিছুকালের জন্য ফুল ফুটিয়ে ফুল ঝরিয়ে দেবে দৌড়!'

ওই ফুল ফোটানোর আর অন্ত নেই। আটাত্তর বছর বয়স হয়েছে, নৃত্যনাট্য 'চণ্ডালিকা'র খসড়া তৈরি করছেন, 'গীতবিতানে'র নতুন সংস্করণ হবে, তাই দেখে দিচ্ছেন। 'গীতবিতান' প্রকাশন যে কি বিরাট কাজ সাধারণ লোকের সে বিষয় কোনো ধারণাই নেই। প্রত্যেকটি গান সাজিয়ে গুছিয়ে তোলাই এক ব্যাপার। দেড় হাজার গান নিখুঁতভাবে গুছিয়ে ছাপানো যে কি বিরাট কাজ সে ভাবা যায় না।

এ ছাড়া অতিথি আপ্যায়ন তো ছিলই নিত্য কর্তব্য। শুধু যে লাট বড়লাট শান্তিনিকেতনের আতিথ্য নেন তা নয়, যে বিদেশীই ভারতবর্ষ দেখতে আসেন, প্রায় প্রত্যেকেই একবার শান্তিনিকেতন দেখে না গেলে এ দেশ দেখা সম্পূর্ণ হল না মনে করেন। এঁদের সুযোগ্য অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করাও কম কথা নয়। কবি নিজে সমস্ত খুঁটিনাটির কথা ভেবে রাখতেন। সে বছর গ্রীষ্মকালে রবীন্দ্রনাথ কালিম্পং গেলেন। কালিম্পং হল হিমালয়ের পাদদেশে ছোট শহর, দার্জিলিং-এর মত অত উঁচুতে নয় বলে অত ঠাণ্ডাও নয়। কালিম্পং থেকে মংপুতে গিয়ে মাস দেড়েক লেখিকা মৈত্রেয়ী দেবীর

অতিথি হয়ে কাটালেন। সে সময়ের কথা মৈত্রেয়ী দেবীর লেখা 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' বইখানিতে পাওয়া যায়।

বয়স কবির কিছু করতে পারে নি, সমানে লিখে যাচ্ছেন। কবিতা তো বটেই, তার উপর বাংলা ভাষার বিষয় একখানি বই। আরাম কেদারায় ঠেস দিয়ে বসে, সামনে একটা বোর্ড নিয়ে, তার উপর লেখার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন মৈত্রেয়ী দেবী। কবির সেটা পছন্দ হল না, চেয়ারে বসে টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে না লিখলে তাঁর নাকি লেখা আসে না!

আলস্য তাঁর ধারে কাছে ঠাঁই পায় না. ভোর থেকে লেখাপড়া চলে; কখনো বা গভীরভাবে চিন্তা করেন, বই পড়েন। বিদেশ থেকে অমিয় চক্রবর্তী বই পাঠান, সে সব পড়েন। চিঠিপত্রও লেখেন, তবে ফরমায়েসী কবিতা, নামকরণ ইত্যাদিতে আজকাল বিরক্তি আসে। কোনো লেখক কবির রচনা সম্বন্ধেই বই লিখেছেন, সেটি পড়ে নিজের মতামত লিখছেন। বলছেন, 'অত ব্যাখ্যা করে কোন কবিতা ভালো কোনটা মন্দ তা প্রমাণ করতে হয় না, কাব্য-জগতে ছেলেমেয়েরা ইচ্ছা মত ভালো মন্দ খুঁজে বের করুক, তাদের শুধু একটু পথ দেখিয়ে দিও।' আবার মাঝে মাঝে মৃত্যু আর মৃত্যুর পরের অজানালোকের কথাও যেন কবির মনে পড়ে।

দু মাস পাহাড়ে কাটিয়ে শান্তিনিকেতনে ফিরে এলেন, তখন ছুটি শেষ হয়ে গেছে। আবার কাজের চাকা ঘুরতে থাকে।

এরই মধ্যে শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু সংবাদ এল। পুরনো সব স্নেহের বন্ধন একে একে খুলে পড়ে যাচ্ছে, কিন্তু এ বয়সে শোক আর কবিকে তেমন স্পর্শ করতে পারে না, তবু মনে দুঃখ পান বই কি!

লেখাও চলছে, কিছু কিছু কবিতা, পুরনো গল্প ভেঙে নাটিকা, তার মধ্যে প্রচুর রসের খোরাক। কিন্তু কবির বয়স হয়েছে

আটাত্তরের উপরে, চোখে যেন একটু কম দেখছেন। তবু সে বছরও গান্ধীজীর জন্মদিন উপলক্ষে উৎসব করলেন। তারপর পুজোর ছুটি এল, কবি শান্তিনিকেতনেই থেকে গেলেন।

সময়টা ভালো ছিল না, ১৯৩৮ সাল, আসন্ন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ছায়া পড়েছে সমস্ত পৃথিবীতে। কবি যেন আগে থাকতেই তার আভাস পাচ্ছেন, সমস্ত য়ুরোপ যে তার চেনা। অশান্তির হাওয়া ক্রমে ছড়াতে থাকে। কবি লিখেছেন 'প্রায়শ্চিত্ত' কবিতা। তার মধ্যে বলেছেন,

'যদি এ ভুবনে থাকে আজো তেজ
কল্যাণশক্তির,
ভীষণ যজ্ঞে প্রায়শ্চিত্ত
পূর্ণ করিয়া শেষে
নূতন জীবন নূতন আলোকে
জাগিবে নূতন দেশে।'

এই কল্যাণ শক্তিতে কবি চিরদিন বিশ্বাস রেখে এসেছেন, সুখে দুঃখে নিজের নিভৃত অন্তর্লোকে সেই তো তার চিরদিনের একমাত্র সহায়।

পুজোর ছুটিও শেষ হয়ে যায়। আশ্রমে এখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক স্কাউট নায়কদের শিক্ষা শিবির হয়েছে। তাদের কবি বললেন, কখনও বুড়ো হয়ো না। আমার চুল পেকে গেছে তবু বুড়ো হই নি, তার কারণ এই পৃথিবীটাকে, এই জীবনটাকে আমি বড়ো ভালোবাসি।

আরো পাঁচ রকমের কাজ এসে কবিকে ঘিরে ধরে। মনটা যতই না দূরে দূরে বিচরণ করতে চায়, আশ্রমের হাজার রকম প্রয়োজন এসে দরজার কড়া নাড়ে।

কলকাতায় শ্রীনিকেতন শিল্পভবনের একটি স্থায়ী ভাণ্ডার খোলা হল। সুভাষচন্দ্র তখন কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট, তিনি তার দ্বার উন্মোচন

করলেন। অসুস্থতার জন্য কবি আসতে পারলেন না, নিজের ভাষণ লিখে পাঠালেন। তবে শান্তিনিকেতনের উৎসবাদিতে নিজেই আসেন, রথীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বছরের জন্মদিন করা হল, সাতই পৌষের উৎসব হল, কবি উপাসনা করলেন, সভা ইত্যাদিতে যোগ দিলেন। এল্মহার্স্ট সাহেব, এণ্ড্রুজ সাহেব দুজনেই এবার এসেছিলেন। কিছুদিন পরে সুভাষচন্দ্রও এলেন।

পরের বছরও যথারীতি বসন্তোৎসব হল। নববর্ষের পরদিন কবি কলকাতা হয়ে পুরী গেলেন। সেখানে বড় শান্তিতে আরামে ছিলেন। কেউ তাঁকে কোনো সভাতে টেনে নিয়ে যেতে পারে নি।

পুরী থেকে ফিরে আবার মংপুতে গিয়ে একমাস কাটিয়ে এলেন। বই পড়েন, কবিতা কিছু কিছু লেখেন, অনেক আলাপ আলোচনা করেন, গৃহস্বামিনীর আদর যত্নে আরামে থাকেন।

একমাস পরে যখন শান্তিনিকেতনে ফিরলেন তখনো গ্রীষ্মের ছুটি চলছে, কিন্তু কাজের অন্ত নেই। রবীন্দ্রবচনাবলী প্রকাশনের ব্যবস্থা হচ্ছে। যাঁরা ব্যবস্থা করছেন কবির সঙ্গে বারে বারে তাঁদের পরামর্শ করতে হচ্ছে, ভূমিকাটাও লিখে দিচ্ছেন কবি। পুরনো অনেক লেখাকে কবি বাদ দিতে চান, এদের সঙ্গে সব সময় মতে মেলে না। এ বিষয় কবি বলেছেন, জীবনের সব কাজকে পেছনে টেনে বেড়াতে হয় না, মানুষদের পূর্বপুরুষদের তো একটা করে লেজও ছিল, ইতিহাসের সঙ্গে মানুষরা কি সেটাকেও টেনে বেড়াবে নাকি?

তবে নতুন লেখা এই সময় বড় একটা লেখেন নি, কয়েকটি অপূর্ব কবিতা ও গান ছাড়া।

১৯৩৯ সালের ডিসেম্বর মাসে রথীন্দ্রনাথের পালিতা কন্যা, কবির সেই 'তিন বছরের প্রিয়া'র বিবাহ হল শান্তিনিকেতনে, মহা ঘটা করে। তারপরে ফেব্রুয়ারি মাসে গান্ধীজী এলেন কস্তুরী বাঈকে

সঙ্গে নিয়ে। কত যে দীর্ঘদিনের কত প্রীতির কথা, কত আশা আকাঙ্ক্ষার কথা হয়েছিল দুজনার মধ্যে, বাইরের লোকের কাছে সে সব বলাও যায় না। গান্ধীজী এবার দিল্লী ফিরেই আশ্রমের দায়িত্বের কথা সেখানে সকলকে জানান, তখন থেকেই শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে তাঁর নিজেরও একটা দায়িত্ববোধ এসেছিল।

আশি বছর প্রায় বয়স কবির, তবু স্থির হয়ে বসবার লোক তিনি নন। মংপুতে আরেকবার গিয়েছিলেন, তারপর মেদিনীপুরে, আবার সিউড়ি, বাঁকুড়াতে। লোকেও ডাকে, তিনিও অমনি সাড়া দেন।

১৯৪০ সালে এণ্ড্রুজ সাহেবের মৃত্যু হল। কবি তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের আরেকজনকে হারালেন। সে বছরটা ছিল ছাড়াছাড়ির বছর, আদরের ভাইপো সুরেন্দ্রনাথ গেলেন, প্রিয় সহকর্মী কালী-মোহন ঘোষও গেলেন।

তবু শান্তিনিকেতনের কাজ করে যাচ্ছেন, লিখছেন, অন্যের লেখা দেখে দিচ্ছেন, এমন কি বড় ছেলেদের পড়াচ্ছেন।

ওই বছর আগস্ট মাসে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি পাঠিয়ে কবিকে সাহিত্যাচার্য উপাধি দিলেন।

কিন্তু সময় তো কাউকে ছেড়ে দেয় না। প্রায় আশি বছরের কবিকেও না। চোখের দৃষ্টি, শ্রবণশক্তি কমে গেছে। চলে ফিরে বেড়াতে আর পারেন না, তবু একটা ঠেলা চেয়ার-গাড়িতে ঘোরাঘুরি করেন। লেখেনও। ছোট গল্প 'ল্যাবরেটরি' এই সময়ে লেখা।

কবি একটা কিছু মনে মনে স্থির করলে তাঁর মত বদলানো খুব সহজ ছিল না। এ বছরও একরকম জোর করে কালিম্পং গেলেন, সকলের মানা সত্ত্বেও। সেখানে সাত দিন পরে এত অসুস্থ হয়ে পড়লেন যে তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসা হল।

কিছুদিন গুরুতর রোগে শয্যাশায়ী হয়ে থাকলেন, তার মধ্যে

মুখে মুখে কবিতা রচনা করেন, অন্যরা লিখে নেয়। কানের কাছে জোরে কথা না বললে শুনতে পান না। কিন্তু কাব্য-প্রতিভা অমলিন। 'রোগশয্যা'র কবিতা এই সময় লেখা। তারপর শান্তি-নিকেতনে ফিরে 'আরোগ্যে'র কবিতা লিখতে থাকেন, 'রোগশয্যা'রও কিছু বাকি ছিল।

ষোড়শ অধ্যায়

এবার শরীর আর কিছুতেই যেন জোড়া লাগে না। পৃথিবীর আলো, যে আলোতে তিনি জগৎকে এত সুন্দর করে দেখেছিলেন, সে আলো যেন চোখ থেকে ক্রমে সরে যেতে লাগল। তবুও জগতের যিনি পালক, তাঁর উপর বিশ্বাস যায় নি। 'রোগশয্যায়'-এ লিখেছিলেন,

'অজস্র দিনের আলো
দু চক্ষুরে দিয়েছিলে ঋণ
ফিরায়ে নেবার দাবি জানায়েছ আজ
তুমি মহারাজ।'

পৃথিবীর শব্দ, যে শব্দের মধুর ঝংকার সারাজীবন মুগ্ধ হয়ে শুনেছিলেন, সেও ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসতে লাগল। প্রাণের জ্যোতি কিন্তু একটুও ম্লান হল না। কেবল বই পড়া শুনছেন, নিজে আর পড়তে পারেন না। আশ্চর্য ব্যাপার, প্রবন্ধ লেখাচ্ছেন, নিজের হাতে লেখা মুশকিল। অদ্ভুত প্রতিভা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত শুকিয়ে যাচ্ছে না।

শরীরের নানান কষ্ট, কিন্তু মুখে হাসি। যেন বুঝতে পেরেছেন ঘাটে এবার যাবার নৌকো এসে লাগবে। তোড়জোড় করছেন, যাকে যা বলবার বলে নিচ্ছেন।

শান্তিনিকেতনের ঋতুউৎসব বন্ধ হচ্ছে না, দেশ বিদেশ থেকে লোক আসছে কবিকে দর্শন করতে। সূর্যাস্তের সময় যেন আকাশে লালের সোনালীর অপূর্ব বাহার।

পৌষ উৎসব হল, কবির জীবনের শেষ উৎসব, উঠে যোগ দিতে পারলেন না, ভাষণ পাঠালেন। শান্তিনিকেতনে আছেন, অথচ

আমবাগানে সবার সঙ্গে গিয়ে জুটতে পারছেন না, কবির সে কি দুঃখ !

তারপরে আবার নববর্ষ এল, নতুন গান লিখে দিলেন। শান্তিনিকেতনে ওইদিনে কবির জন্মোৎসব করা হয়, তার জন্য ভাষণ দিলেন।

'জন্মদিনে' কবিতার বই এ সময় বেরুল, এই তাঁর শেষ কবিতার বই। ছোটবেলাকার স্মৃতি দিয়ে তৈরি 'গল্প-সল্প'ও বেরুল। এমনি করে যারা বাঁচতে জানে, তাদের জীবন পরিপূর্ণতা পায়। সম্পূর্ণ সুন্দর একটা বালার মতো ঘুরে এসে, জীবনের আরম্ভটি আর শেষটি কাছাকাছি এসে যায়, যেন বালার মুখ দুটি।

চোখে ভালো দেখেন না, কানে ভালো শোনেন না, তবু মনটা হীরের মত উজ্জ্বল। রাজনীতি, সমাজনীতি সম্বন্ধে এ সময় যে সব কথা বলেছিলেন, পরে সে সব যেন ভবিষ্যৎ-বাণীর মত ফলে গেল।

জীবনের শেষের কয়েকটি বছর বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের ছায়ায় কেটেছিল। শেষ পর্যন্ত তাই নিয়ে চিন্তা করতেন। মিস রাথবোন বলে এক ইংরেজ মহিলা পত্রিকাতে ভারতবর্ষের নামে অপমানকর কথা লিখেছিলেন, শেষশয্যা থেকেও কবি তখনি তার প্রতিবাদ পাঠিয়েছিলেন, এমনি ছিল তাঁর চরিত্রের তেজ।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত শরীর আর পারল না, কলকাতায় এলেন অস্ত্র করাবার জন্য। সেই তাঁর শান্তিনিকেতন ছেড়ে চিরকালের মত চলে আসা। শেষবারের মত আশ্রমের পথঘাট চেয়ে চেয়ে চোখ ভরে দেখে নিলেন। পথে রেলে নিশ্চয় কষ্ট হয়েছিল, তবু সহযাত্রীদের সঙ্গে রসের কথা বলতে ছাড়েন নি। যতদিন রোগশয্যায় পড়ে থেকেছেন, যাদের সেবা নিতে বাধ্য হচ্ছিলেন, ছড়ায় গল্পে তাদের দিনগুলোকে মধুময় করে দিতেন। জীবনে কখনও কারো

সেবা নিতে চাইতেন না। ওরা যে তাঁর সেবা করতে পেরে ধন্য হয়ে যাচ্ছে কবির সে কথা মনেও হত না। খালি ভাবতেন ওর সেবা করতে গিয়ে ওদের না কষ্ট হয়।

কলকাতায় এসেছিলেন ৯ই শ্রাবণ। অস্ত্রোপচারের কয়েকদিন পর থেকেই শরীরের অবস্থা ক্রমে মন্দের দিকে যেতে লাগল। অবশেষে বাইশে শ্রাবণ রাখি-পূর্ণিমার দিন বেলা বারোটার কিছুক্ষণ পরে যে সুন্দর চোখ দিয়ে সৃষ্টির এত রূপ দেখেছিলেন, সে চোখ চিরকালের মত বুজলেন।

এমন মৃত্যু কম দেখা যায়। শান্ত সমাহিত সুন্দর। যারা কাছে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁরা অবাক হয়ে দেখলেন, এতটুকু চাঞ্চল্য নেই, মুখের ভাবের এতটুকু পরিবর্তন নেই; শুধু এই নিশ্বাস পড়ছিল, এই নিশ্বাস পড়া বন্ধ হয়ে গেল। নৌকো ঘাটে এসে লাগল; যেমনি খালি হাতে আশি বছর আগে কবি এসেছিলেন তেমনি খালি হাতে নিঃশব্দে গিয়ে যেন নৌকোতে উঠে বসলেন। সমস্ত আকাশ, বাতাস, পৃথিবী আলোর আলোময় হয়ে রইল।

— —